ইমাম আবূ হানীফা (র)

আল-ফিক্‌হুল আক্‌বর

(ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস)

ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান
অনূদিত ও সম্পাদিত

ইমাম আবূ হানীফা (র)

আল-ফিক্‌হুল আক্‌বর

(ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস)

ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান

অনূদিত ও সম্পাদিত



ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

ইমাম আবূ হানীফা (র) আল-ফিক্‌হুল আক্‌বর
ড. মুহাম্মদ মুস্তাফিজুর রহমান (অনূদিত-সম্পাদিত)

ইফাবা অনুবাদ ও সংকলন প্রকাশনা-১৯৭
ইফাবা প্রকাশনা : ২০৪৯
ইফাবা গ্রন্থাগার : ২৯৭.২৯
ISBN : 984-06-0661-1

প্রকাশকাল
আষাঢ় ১৪০৯
রবিঃ সানি ১৪২৩
জুন ২০০২

প্রকাশক
মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক, প্রকাশনা বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

মুদ্রণ ও বাঁধাই
মোঃ সিদ্দিকুর রহমান
প্রকল্প ব্যবস্থাপক (ভারপ্রাপ্ত)
ইসলামিক ফাউন্ডেশন প্রেস
আগারগাঁও, শেরেবাংলা নগর, ঢাকা-১২০৭

প্রচ্ছদ
জসিম উদ্দিন

মূল্য : ৩২.০০ টাকা মাত্র

Al-Fiqhul Akbar (Aqaid) written by Imam Abu Hanifa (R): translated and edited by Dr. Muhammad Mustafizur Rahman in Bangla and published by Muhammad Abdur Rab, Director, translation, Islamic Foundation Bangladesh, Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. June 2002

Price : Tk 32·00 ; US Dollar : 1·00

সূচিপত্র

মহাপরিচালকের কথা

সাহাবায়ে কিরাম ও খুলাফায়ে রাশেদার সোনালী যুগের অবসানে মুসলিম সমাজে দেখা দেয় নানাবিধ ফিতনা-ফাসাদ। বিভিন্ন ফিরকার অনুসারিগণ মুসলিম সমাজে কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত শিক্ষা বিবর্জিত নিজ নিজ ফিরকার মতাদর্শ প্রচার করতে থাকে। ফলে মুসলিম উম্মাহর জীবনে নেমে আসে আকীদাগত চরম দুর্দিন। বাতিল মতবাদ ও ভ্রান্ত আকীদায় নিমজ্জিত হয়ে পড়ে মুসলিম উম্মাহ। মুসলমানদের এই ঘোর দুর্দিনে তাদেরকে অমানিশার অন্ধকার হতে আলোর পথের সন্ধান দিতে এগিয়ে আসেন কালজয়ী মহাপুরষ ইমাম আযম আবূ হানিফা (র)। তিনি রচনা করেন আল-ফিকহুল আকবর, আল-ফিকহুল আবসাত, আল-আলিম ওয়াল মুতায়াল্লিম ইত্যাদি গ্রন্থ। এসব গ্রন্থে রয়েছে ইসলামী আকীদা ও ধর্মীয় মতাদর্শের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ।

ইমাম আযম আবূ হানিফা (র) প্রণীত গ্রন্থাবলীর মধ্যে 'আল-ফিকহুল আকবর' এক বিশেষ স্থান অধিকার করে আছে। এই গ্রন্থে তিনি ইসলামের দশটি মৌলিক আকীদার কথা উল্লেখ করেছেন, যাতে বিভিন্ন ভ্রান্ত মতাদর্শী ফিরকার মতবাদসমূহ যুক্তি-প্রমাণসহ খণ্ডন করে তিনি ইসলামের মূল আকীদা, ধর্মীয় আচরণ প্রতিষ্ঠা করার প্রয়াস পেয়েছেন। তিনি গ্রন্থটিতে এ বিষয়ে যুক্তি-প্রমাণসহ জোরালো বক্তব্য উপস্থাপন করেছেন।

'আল-ফিকহুল আকবর' গ্রন্থটি মিশরসহ বিশ্বের বহু দেশে মুদ্রিত হয়েছে। মূল্যবান এ গ্রন্থটির বহু ভাষ্যও রচিত হয়েছে। এ সবের মধ্যে মোল্লা আলী কারী (র) বিরচিত ভাষ্যটি সমধিক পরিচিত। প্রখ্যাত শিক্ষাবিদ ও অনুবাদক ড. মুস্তাফিজুর রহমান 'আল-ফিকহুল আকবর' গ্রন্থটি মূল আরবী থেকে বাংলায় অনুবাদ করেন। এ ধরনের একটি মূল্যবান গ্রন্থের অনুবাদ পাঠকের হাতে তুলে দিতে পেরে আমরা আল্লাহ তা'আলার শুকরিয়া আদায় করছি। মুবারকবাদ জানাচ্ছি বিজ্ঞ অনুবাদক, সম্পাদক ও এর প্রকাশনার সাথে সংশ্লিষ্ট অন্যান্য সকলকে।

সৈয়দ আশরাফ আলী
মহাপরিচালক
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রকাশকের কথা

সাহাবায়ে কিরামের স্বর্ণযুগের অবসানের পর উমাইয়্যা শাসনামলে মুসলিম জাহানে নেমে আসে আকীদাগত বিপর্যয়। উদ্ভব ঘটে বিভিন্ন বাতিল ফিরকার। প্রত্যেক ফিরকার অনুসারিগণ আপন আপন ফিরকার মতবাদ প্রচার শুরু করে। ফলে সাধারণ মানুষ বিভ্রান্তির শিকার হয়। উপরন্তু এ সময়ে গ্রীক দর্শনের আরবী অনুবাদ প্রকাশিত হওয়ার কারণে মুসলিম সমাজ গোলকধাঁধায় নিপতিত হয়। মানুষ ক্রমশ কুরআন ও সুন্নাহর প্রকৃত শিক্ষা হতে দূরে সরে যেতে থাকে। ইসলামী আকীদা ও বিশ্বাসের সাথে অনৈসলামিক মতাদর্শের সংমিশ্রণের ফলে সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রকৃত সত্য নির্ণয় করা কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ে। মুসলিম উম্মাহর এহেন বিপর্যয়কর অবস্থায় আবির্ভূত হন কালের শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বিশিষ্ট ইসলামী আইন-শাস্ত্রবিদ ইমাম আযম আবূ হানিফা (র)

তিনি মুসলিম উম্মাহর এই বিপর্যস্ত অবস্থা প্রত্যক্ষ করে তাদের ঈমান ও ইসলামী আকীদার হিফাযতের জন্য কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করেন। এর মধ্যে আল-ফিকহুল আকবর, আল-ফিকহুল আবসাত, আল-আলিম ওয়াল মুতায়াল্লিম, আর-রিসালা এবং আল-ওয়াসিয়া-এর নাম উল্লেখযোগ্য। এসব গ্রন্থে ইমাম সাহেব চরমপন্থী খারিজী, শিয়া, দাহরিয়া, জাবারিয়া, কাদারিয়া, মুরজিয়া ও মু'তাযিলা সম্প্রদায়ের মতবাদসমূহ যুক্তি-প্রমাণসহ ভ্রান্ত প্রমাণ করেন এবং আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামায়াতের কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক ইসলামী আকীদা ও বিশ্বাস পুন:প্রতিষ্ঠা করেন।

ইমাম আবূ হানিফা প্রণীত আকায়েদ বিষয়ক গ্রন্থমালার মধ্যে 'আল-ফিকহুল আকবর' শীর্ষক গ্রন্থটির স্থান শীর্ষে। এ দেশের খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ অধ্যাপক ড. মুস্তাফিজুর রহমান এ গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করে ইসলামের এক বিরাট খেদমত আনজাম দিয়েছেন।

বিজ্ঞ অনুবাদকের শব্দ চয়ন, ভাষাশৈলী ও অনুবাদ নৈপুণ্যে গ্রন্থখানি শিল্পমানসম্পন্ন ও প্রাণবন্ত হয়ে উঠেছে। আমরা আশা করছি গ্রন্থটি পাঠক সমাজে বিপুলভাবে সমাদৃত হবে। আরো আশা করছি যে, গ্রন্থটি বর্তমান বিশ্বের বিভিন্ন বাতিল মত পরিহার করে কুরআন ও সুন্নাহভিত্তিক খাঁটি ইসলামী আকীদা ও ধর্মীয় বিশ্বাসের উপর আমল করার জন্য সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। গ্রন্থটির বিজ্ঞ অনুবাদক, সম্পাদক ও প্রকাশনার সাথে সম্পৃক্ত সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করছি।

গ্রন্থটি নির্ভুলভাবে প্রকাশ করার জন্য সর্বাত্মক সতর্কতা অবলম্বন করা হয়েছে। তবুও সুধীজনের নজরে কোন ভুল-ভ্রান্তি পরিলক্ষিত হলে আমাদের অবহিত করার অনুরোধ রইল। পরবর্তী সংস্করণে তা সংশোধনের ব্যবস্থা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

মোহাম্মদ আবদুর রব
পরিচালক
অনুবাদ ও সংকলন বিভাগ
ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

অনুবাদকের আরয

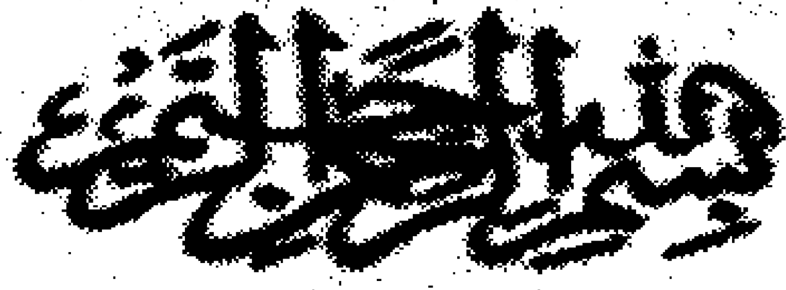
আল-কুরআন সারা জাহানের জন্য হিদায়াত ও পথনির্দেশ। মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সারা জাহানের জন্য রহমত। তিনি তাঁর জীবন দিয়ে আল-কুরআনকে বাস্তবায়িত করে দেখিয়ে গেছেন। তাঁর জীবন আল-কুরআনের জীবন্ত ব্যাখ্যা। তাই হাদীস ও কুরআন মর্মের দিক দিয়ে এক ও অভিন্ন। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবন কালে ও সাহাবায়ে কিরামের যামানায় সরাসরি রাসূলুল্লাহ্ (সা) অথবা সাহাবায়ে কিরামের কাছ থেকে যে কোন সমস্যার সমাধান মানুষ লাভ করত। সে সময় তেমন কোন অবস্থার সৃষ্টি হয়নি, যাতে করে ইসলামের বিধিবিধান লিপিবদ্ধ না করলে সামাজিক বা রাষ্ট্রীয় জীবন ক্ষতিগ্রস্ত হতো। কিন্তু পরবর্তীকালে যখন মুসলিম সাম্রাজ্য ব্যাপক বিস্তৃতি লাভ করল এবং নানা ভাষার, নানা সভ্যতার, নানা চিন্তা-চেতনার মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হতে লাগল, এবং সাহাবায়ে কিরামের যামানাও শেষ হয়ে আসলো, তখন লিপিবদ্ধ বিধি-বিধানের অপরিহার্যতা প্রকট হয়ে দেখা দিল। ব্যবহারিক জীবনে ইসলামী আইন-কানুন যেমন প্রয়োজন, আকাইদের ক্ষেত্রে তেমনি নিয়ম-নীতির প্রয়োজন। সাহাবায়ে কিরাম কুরআন ও হাদীস থেকে ও নিজেদের ইজতিহাদ দিয়ে এসব প্রয়োজন মিটাতেন। তাঁদের এসব কর্মকাণ্ড ছিল অধিকাংশ অলিখিত। উমাইয়্যা আমলের শেষের দিকে এবং বিশেষ করে আব্বাসীয় শাসনের প্রথম থেকেই মুসলিম মিল্লাত আকীদার ক্ষেত্রে ও ব্যবহারিক বিধি-বিধানের ব্যাপারে এক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয়। এ সময় মু'তাজিলা, মুরজিয়া, শিয়া, কাদারিয়া, জাবারিয়া, দাহরিয়া, খারিজিয়া প্রভৃতি ফিরকার আবির্ভাব ঘটে। অন্য দিকে গ্রীক, মিসরীয়, ভারতীয় ও অন্যান্য দর্শনের আরবী ভাষায় অনুবাদের কারণে মুসলিম মানস দারুণভাবে আন্দোলিত ও তাড়িত হতে থাকে। তাছাড়া রাষ্ট্রিয় ক্ষমতা বদলের কারণে বিশেষ করে দামিস্ক থেকে বাগদাদে দারুল খিলাফত স্থানান্তরিত হওয়ায় বুদ্ধিবৃত্তির ক্ষেত্রে সূচিত হয় এক নতুন অধ্যায়।

কাওম ও মিল্লাতের এহেন দু:সময়ে আল্লাহ্ তা'আলা ইমাম আবূ হানীফা (র)-কে পাঠান, যিনি যাবতীয় ভয় ও প্রলোভন, নির্যাতন ও অত্যাচার উপেক্ষা করে দিয়ে গেছেন সমাধান। কুফার উমাইয়্যা গভর্ণর ইব্‌ন হুবায়রা ও পরে আব্বাসীয় খলীফা আল-মানসূর তাঁকে ক্বাযীর পদ প্রদানের প্রস্তাব করলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে তাঁকে দৈহিক শাস্তি ভোগ করতে হয় এবং পরিণামে বিষপানে কারারুদ্ধ অবস্থায় প্রাণত্যাগ করতে হয়। তিনি এসব-ই সহ্য করেছেন শুধু নীতির জন্য। তিনি চাইলে তাঁদের নির্দেশ

পালন করে মহা আয়েশ-আরামে প্রধান বিচারপতির পদ অলঙ্কৃত করে জীবন-যাপন করতে পারতেন। তিনি তা করেননি। জীবন দিয়ে প্রমাণ করেছেন যে, নীতির প্রশ্নে আপোষ নেই। স্বৈরাচার ও বদলোকের হুকুম মেনে ইসলামের কাজ করা যায় না। তিনি এ জন্য একদিকে ইলমে ফিক্হ ও ইলমে কালামের সুদৃঢ় অবকাঠামো নির্মাণ করেন, অন্যদিকে নিজের জীবন দিয়ে প্রত্যক্ষ উদাহরণ রেখে যান কি করে এক মর্দে মু'মিন আপোষহীন ভাবে প্রতিকূল অবস্থায়ও ইসলামী ঝাণ্ডা উড্ডীন রাখতে পারে।

তিনি তাঁর শাগরিদদের মধ্য থেকে যোগ্য পণ্ডিতদের নিয়ে একটি পরিষদ গঠন করে ফিক্হ শাস্ত্রের খিদমত আঞ্জাম দেন। নিজে সমকালীন বৈরী আকীদার অপনোদনের জন্য বিভিন্ন বিতর্ক ও আলোচনার অবতারণা করেন এবং স্থায়ীভাবে আকাইদের ভিত রচনার জন্য কয়েকটি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। আল-ফিক্হুল আক্বর তার অন্যতম। এ বইটি কলেবরে ছোট। কিন্তু এর উপর নির্ভর করে পরবর্তীকালে রচিত হয়েছে অসংখ্য বিরাট বিরাট গ্রন্থ। এর আছে বহু শরাহ্। পৃথিবীর প্রায় সবক'টি প্রসিদ্ধ ভাষায় এটি অনূদিত হয়েছে। কিন্তু বাংলায় আজ পর্যন্ত এর কোন তরজমা বা শরাহ্ হয়নি, যদিও এ অঞ্চলের প্রায় ১০০ শতাংশ মুসলিম হানাফী ফিকহের অনুসারী। এ কাজটি খুব সহজসাধ্য নয়। আল্লাহ্র ওপর ভরসা করে এর তরজমা ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা প্রদান করা হলো। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর জীবন এবং কর্মও অতি সংক্ষেপে পেশ করা হলো। ঈমান ও আকীদার ক্ষেত্রে যদি এ প্রয়াস কোন কাজে আসে তবেই আল্লাহ্র রহমত ও মাগফিরাত আমাদের শামিলে হাল হবে।

মুস্তাফিজুর রহমান



হযরত ইমাম আবূ হানীফা (র) ঃ জীবন ও কর্ম

১. জীবন

ইমাম আবূ হানীফা আল নু'মান ইবন ছাবিত ইব্ন যূতী হি. ৮০/৭০০ খ্রী. কুফায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর দাদা যূতী ছিলেন ফারিসের অধিবাসী। তিনি ছিলেন অগ্নি উপাসক। ৩৬ হিজরীতে তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং স্ত্রীকে নিয়ে হিজরত করে মক্কার পথে দেশ ত্যাগ করেন। কূফায় পৌছে তিনি হযরত আলী রাদিআল্লাহু আনহুর সান্নিধ্য লাভ করেন এবং এখানেই তিনি স্থায়ীভাবে বসবাস করার সিদ্ধান্ত নেন। তিনি কাপড়ের ব্যবসা দ্বারা জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করেন। একবার নওরোজের সময় তিনি কিছু ফালুদা হযরত আলী (রা)-কে উপহার দিলে তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন : এ কি জিনিস ? তিনি বলেন, নওরোজের ফালুদা। হযরত আলী (রা) বলেন : আমাদের এখানে প্রতিদিন নওরোজ। ৪০ হিজরীতে যূতীর এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। নাম রাখেন ছাবিত। বরকতের জন্য তাঁকে হযরত আলী (রা)-এর কাছে নিয়ে এলে তিনি শিশুর মাথায় হাত বুলিয়ে দোয়া করে দেন। শিশু ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে। কিন্তু বেশী দিন যেতে না যেতেই তাঁর পিতা মারা যান। মায়ের স্নেহে লালিত পালিত ছাবিত পিতার প্রাচুর্যে সুখেই দিনাতিপাত করতে থাকেন। তার ৪০ বছর বয়সে ৮০ হিজরীতে তার ঘরে এক পুত্র সন্তান জন্ম গ্রহণ করে। জনক জননী আদর করে নাম রাখেন নু'মান। ইনিই বিশ্ব বিখ্যাত ইমাম আবূ হানীফা।

এ সময় উমাইয়্যা শাসক আবদুল মালিক ইবন মারওয়ান মুসলিম জাহানের শাসনকর্তা ছিলেন। হাজ্জাজ ইবন ইউসুফ ইরাকের গভর্ণর ছিলেন। তখন পৃথিবীতে অনেক সাহাবী জীবিত ছিলেন। তাঁদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আবদুল্লাহ্ ইবন আল হারিছ (রা) মৃ. ৮৫ হি.; ওয়াছিলা ইবন আল-আসকা'আ (রা) মৃ. ৮৫ হি.; আবদুল্লাহ্ ইব্ন আবি আওফা (রা) মৃ. ৮৭ হি. সাহাল ইব্ন সা'য়াদ (রা) মৃ. ৯১ হি.' আনাস ইব্ন মালিক (রা) মৃ. ৯৩ হি.; মাহমুদ ইব্ন লবীদ আল-আশ্হালী (রা) মৃ. ৯৬ হি.; আবদুল্লাহ্ ইব্ন ইউছর আল-মাযানী (রা) মৃ. ৯৬ হি. মাহমুদ ইব্ন আরবাবী আল-আনসারী (রা) মৃ. ৯৯ হি.; আল-হারমাম ইব্ন যিয়াদ আল-বাহিলী (রা) মৃ. ১০২ হি.; আবূ আল তোফায়েল আমির ইব্ন ওয়াছিলা আল-কিনানী (রা) মৃ. ১০২ হি.; ইনিই সাহাবীদের মধ্যে সর্বশেষ ইন্তিকাল করেন। আবূ হানীফা এদের সকলের না হলেও অন্তত:

সাতজনের সাক্ষাৎ লাভ করেন এবং তিনজনের নিকট থেকে দরস হাসিল করেন। তিনি ছিলেন তাবিঈ।

তিনি শৈশবে নিজগৃহে শিক্ষা লাভ করেন। তারপর কূফার মসজিদে আরবী ব্যাকরণ, কবিতা, সাহিত্য, তর্কশাস্ত্র ইত্যাদি শিখেন। তিনি কালাম শাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভ করেন এবং অন্যদের সঙ্গে বিতর্কে অবতীর্ণ হতেন। এ সময় খারেজিয়া, শিয়া, মুরজিয়া, কাদারিয়া, জাবারিয়া, মু'তাযিলা প্রভৃতি ফিরকার আবির্ভাব ঘটেছিল। রাজনৈতিক দিক দিয়ে উমাইয়্যা শাসনের অবসান ও আব্বাসীয় শাসনের সূচনা হয়। এমন এক যুগসন্ধিক্ষণে তিনি আবির্ভূত হন। তিনি ছিলেন অসাধারণ প্রতিভার অধিকারী। অতি অল্প সময়ের মধ্যে তিনি সমকালীন সমস্যা সম্পর্কে সম্যক ওয়াকিফহাল হন। ১৬ বছর বয়সে তিনি পিতৃহারা হন। পিতা ছিলেন একজন প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী। তাঁর মৃত্যুর পর এ ব্যবসায়ের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে হয় যুবক আবূ হানীফাকে। তাঁর অসামান্য দক্ষতা ও নিষ্ঠায় ব্যবসায়ের পাশাপাশি তিনি কাপড় তৈরীর এক কারখানা স্থাপন করেন, যা কিছুদিনের মধ্যেই অনন্য হয়ে উঠে। এ সময় ৮৬ হিজরীতে আমীর আবদুল মালিক মারা যান এবং অলীদ ইবন আবদুল মালিক আমীর হন। ৯৫ হিজরীতে হাজ্জাজ মারা যান এবং ৯৬ হিজরীতে অলীদও মারা যান। তারপর সোলায়মান ইবন আবদুল মালিক আমীর হন। তিনি ৯৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন এবং উমর ইবন আবদুল আযীয খলীফা হন। তিনি উমাইয়্যা বংশের মারওয়ানী নীতি পাল্টে দেন। ইনসাফ ও ন্যায় বিচার কায়েম করেন। খুতবায় আলী (রা) সম্পর্কে যেসব অশোভন উক্তি উদ্ধৃত করা হতো তা আইন করে বন্ধ করে দেন। উমাইয়্যা খান্দানের লোকেরা বিলাস জীবন-যাপনের জন্য যে সব সরকারী জায়গীর দখল করেছিল তা তিনি বাজেয়াপ্ত করেন। অসাধু ও অত্যাচারী কর্মকর্তাদের অপসারণ করে সৎ ও যোগ্য লোকদের নিয়োগ প্রদান করেন। শিক্ষা বিস্তারের ক্ষেত্রে সার্বিক গুরুত্ব আরোপ করেন।

এ যাবৎ ইমাম আবূ হানীফা (র) ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়েই ব্যস্ত ছিলেন। উমর ইবন আবদুল আযীযের যামানায় তাঁর সুপ্ত প্রতিভা বিকাশের সুযোগ এলো। একদিন কার্যব্যাপদেশে কূফার প্রসিদ্ধ আলিম কাযী শা'বীর সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ কোথায় যাও? ওমুক সওদাগরের কাছে, তিনি বললেন। তখন কাযী সাহেব বললেন, আমি জানতে চাইছিলাম, তুমি কার কাছে পড়তে যাচ্ছো। তিনি বললেন ঃ আমি তো কারো কাছে পড়ি না। কাযী শা'বী বললেন ঃ বাছা ! আমি তোমার মধ্যে অসামান্য যোগ্যতা ও অসাধারণ প্রতিভা লক্ষ্য করছি। তুমি জ্ঞান আহরণ করা শুরু কর। শা'বীর কথায় বালক নু'মানের হৃদয় দারুণ ভাবে প্রভাবিত হল। মা'র কাছে এসে সব কথা তিনি বললেন। তাঁর মা ছিলেন একজন বিদ্যোৎসাহী বিদুষী মহিলা। বিদ্যার্জনে পুত্রের আগ্রহ তাকে পুলকিত করলো। তিনি তাৎক্ষণিকভাবে পুত্রকে নির্দেশ দিলেন, ভালো উসতাদ তালাশ করে ইলম হাসিল করতে। আগেই তিনি প্রয়োজনীয় শিক্ষা লাভ করেছিলেন, তাই ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিক্‌হের উচ্চতর শিক্ষার জন্য কূফার শ্রেষ্ঠ

আলিম হাম্মাদ (র)-এর কাছে যান। দু'বছর এখানে তিনি ফিক্‌হ অধ্যয়ন করেন। এ সময় তিনি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তাঁর অসাধারণ প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও মেধা তাঁকে উস্‌তাদের আস্থাভাজন করে দেয়।

দু'মাসের জন্য হাম্মাদ (র) বসরা যান। এ সময় তিনি প্রিয় ছাত্র আবূ হানীফাকে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করে যান। তিনি দক্ষতার সাথে অর্পিত দায়িত্ব পালন করেন। নিয়মিত শিক্ষাদান ছাড়াও তিনি অগণিত আগন্তুকের নানা ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। এমন সব প্রশ্নের উত্তর তাঁকে দিতে হতো, যা তিনি কখনো তাঁর উস্‌তাদের কাছে শুনেননি। ইজতিহাদ করে উত্তর দিতেন। এ ধরনের ৬০টি মাসআলার উত্তর তিনি একটি নোটে লিখে রেখেছিলেন। উস্‌তাদ ফিরে এলে তিনি তা তাঁর সামনে পেশ করেন। হাম্মাদ (র) ৪০ টির উত্তর ঠিক ও ২০টির ভুল হয়েছে বলে জানান। এরপর তাঁর মৃত্যু পর্যন্ত তিনি উস্‌তাদ হাম্মাদ (র)-এর দরবারে ছাত্র হিসাবে কাটান। তাঁর মৃত্যুর পর এখানেই তিনি শিক্ষাদানে নিয়োজিত হন।

ফিক্‌হ অধ্যয়নের পর তিনি হাদীস শিক্ষার জন্য তদানীন্তন হাদীসবেত্তাদের খিদমতে হাযির হন এবং শিক্ষা লাভ করেন। তখনো কোন প্রণিধানযোগ্য হাদীস গ্রন্থ সংকলিত হয়নি। কোন একজন মুহাদ্দিস সকল হাদীসের হাফিয ছিলেন না। সুতরাং তাঁকে অনেক উস্‌তাদের কাছে যেতে হয়। প্রথমে তিনি কূফায় অবস্থানরত মুহাদ্দিসদের থেকে হাদীস শিখেন। এদের মধ্যে ছিলেন : ১. ইমাম শা'বী (র), যিনি ৫ শতাধিক সাহাবাকে দেখেছিলেন। দীর্ঘ দিন তিনি কূফার কাযী ছিলেন। ১০৬ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। ২. সালামা ইব্‌ন কুহাইল; ৩. মুহাজির ইব্‌ন ওয়াছার; ৪. আবূ ইসহাক সাবঈ ; ৫. আওন ইবন আবদুল্লাহ্ ; ৬. সাম্মাক ইবন হারব ; ৭. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ; ৮. আদী ইব্‌ন ছাবিত ; ৯. মূসা ইব্‌ন আবূ আয়েশা (রা)। এদের পর ইমাম আবূ হানীফা (র) বসরা যান। সেখানে তিনি প্রথমে হযরত কাতাদাহ্ (র)-এর খিদমতে হাযির হন এবং হাদীসের দরস হাসিল করেন। হযরত কাতাদাহ্ (র) ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর খাদিম হযরত আনাস (রা)-এর শাগরিদ। হযরত কাতাদা (র) হাদীস বর্ণনায় শব্দ ও অর্থের পরিপূর্ণ সামঞ্জস্য রক্ষা করতেন। তারপর ইমাম আবূ হানীফা (র) হযরত শু'বা (র)-এর দরসে যোগ দেন। তাঁকে হাদীস শাস্ত্রে 'আমীরুল মু'মিনীন' বলা হয়। তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র) সম্পর্কে বলেন : আমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পারি যে, আবূ হানীফা ও ইলম দুই বস্তু নয়। বসরায় তিনি এ দু'জন ছাড়া আবদুল করীম ইব্‌ন উমাইয়্যা (র) ও আসিম ইব্‌ন সুলাইমান (র)-এর কাছ থেকেও হাদীস অধ্যয়ন করেন।

কূফা ও বসরার পর তিনি হারামাইন শরীফাইনের দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। প্রথমে তিনি মক্কা গেলেন। সেখানে তিনি হাদীসবিদ হযরত 'আতা ইব্‌ন আবূ রিবাহ্ (র)-এর দরবারে যান এবং শাগরিদির দরখাস্ত পেশ করেন। তিনি নাম ও আকীদা জানতে চান। ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ নাম নু'মান। পিতা ছাবিত। পূর্ববর্তীদের মন্দ বলি না। গুনাহ্‌গারকে কাফির মনে করি না। ক্বাযা ও কাদরে বিশ্বাস করি। জবাব শুনে হযরত

'আতা (রা) তাঁকে দরসে শামিল হতে অনুমতি দিলেন। ১১৫ হিজরীতে হযরত 'আতা (র) ইন্তিকাল করেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি যখনই মক্কা আসতেন তাঁর খিদমতে হাযির হতেন। এখানে তিনি হযরত ইক্‌রামা (র)-এর কাছ থেকেও হাদীসের সনদ লাভ করেন।

মক্কা থেকে তিনি মদীনা যান। সেখানে প্রথমে হযরত ইমাম বাকির (র)-এর খিদমতে উপস্থিত হন। ইমাম বাকির (র) নাম শুনেই বলে উঠেন ঃ তুমি কি ঐ আবূ হানীফা, যে নিজের যুক্তির ভিত্তিতে আমার দাদার হাদীসের বিরোধিতা করে? তিনি বললেন ঃ আমার সম্পর্কে এ অসত্য রটান হয়েছে। অনুমতি পেলে কিছু বলতে চাই। বললেন ঃ বলো।

আবূ হানীফা (র) বললেন ঃ পুরুষের তুলনায় নারী দুর্বল। যদি যুক্তির ভিত্তিতে আমি সিদ্ধান্ত দিতাম তাহলে বলতাম যে, উত্তরাধিকারের ব্যাপারে নারীকে অধিক দিতে হবে। কিন্তু আমি তা বলি না। বলি ঃ পুরুষ দ্বিগুণ পাবে।

অনুরূপভাবে, রোযা অপেক্ষা নামায উত্তম। যুক্তির ভিত্তিতে কথা বললে বলতাম ঃ ঋতুমতী মেয়েলোকের নামাযের ক্বাযা জরুরী। কিন্তু তা বলি না; বরং বলি ঃ তার ওপর রোযার ক্বাযা জরুরী।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর এ বক্তব্য শুনে হযরত ইমাম বাকির (র) অভিভূত হলেন এবং উঠে এসে কপালে চুমু দিয়ে দোয়া করলেন ও যতদিন ইচ্ছা তাঁর কাছে থাকতে অনুমতি দিলেন। ১১৪ হিজরীতে তাঁর ইন্তিকাল হয়। তাঁর পুত্র হযরত ইমাম জা'ফর সাদিক তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন। ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সঙ্গে তাঁর নিবিড় সম্পর্ক ছিল। আহলে বাইত সম্পর্কে ইমাম আ'যম বলতেন যে, হাদীস ও ফিক্‌হ তথা যাবতীয় মাযহাবী ইলম আহলে বাইতের বিদ্যালয় থেকে নি:সৃত। যখনই তিনি মক্কা ও মদীনায় যেতেন, তখন সেখানে আগত মুসলিম জাহানের বিশিষ্ট পণ্ডিতবর্গের সাহচার্য লাভ করে তিনি তাঁর জ্ঞান আহরণের অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা মিটাতে সচেষ্ট হতেন।

১২০ হিজরীতে হযরত হাম্মাদ (র) ইন্তিকাল করেন। কূফাবাসী হযরত আবূ হানীফা (র)-কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত করেন। তিনি আব্বাসী শাসক মানসূর কর্তৃক ১৪৬ হিজরীতে কারারুদ্ধ হওয়া পর্যন্ত অত্যন্ত দক্ষতার সাথে এ দায়িত্ব পালন করেন। মুসলিম জাহানের সর্বত্র তাঁর সুখ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। অসংখ্য শিক্ষার্থী তাঁর দরসে শামিল হতে থাকে। যেহেতু তখন পর্যন্ত কোন আইন গ্রন্থ রচিত হয়নি, তাই তিনি মুসলিম মিল্লাতের স্বার্থে একাজ সম্পন্ন করার জন্য সংকল্প গ্রহণ করেন। তাঁর কয়েকজন বিশিষ্ট শাগরিদের সমন্বয়ে তিনি একটি পরিষদ গঠন করেন, যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে তাদের ওপর ন্যস্ত দায়িত্ব সমাধা করে উম্মতে মুহাম্মাদীকে চির ঋণী করে রেখেছেন।

১৪৫ হিজরীতে যায়দিয়া ইমাম ইব্‌রাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ আব্বাসিয়া খিলাফতের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসরা অবরোধ করেন। মানসূর এ বিদ্রোহ দমন করে বাগদাদ এসে ১৪৬ হিজরীতে ইমাম সাহেবকে তাঁর কাছে ডেকে পাঠান। তাঁর ধারণা জন্মেছিল

যে, ইমাম সাহেব যায়দিয়াদের পক্ষ অবলনম্বকারী। হত্যা করা হবে এ মতলবেই তাঁকে ডেকে আনা হয়। কিন্তু ইমাম রাভীর পরামর্শে আপাতত সিদ্ধান্ত স্থগিত রেখে তাঁকে ক্বাযীর দায়িত্ব পালনের জন্য অনুরোধ করা হয়। বারবার অস্বীকার করার পরও মানসূর যখন তার নির্দেশ প্রত্যাহার করল না, তখন তিনি তা মেনে নিয়ে বিচারকের আসনে বসেন। বিবাদীর কাছে পাওনার দাবীতে একজন বাদী তাঁর কাছে মামলা দায়ের করে। তিনি বিবাদীকে প্রমাণ উপস্থিত না করতে পারায় কছম করতে বলেন। যখন সে মাত্র 'আল্লাহ্‌র কসম' উচ্চারণ করল, তখন ইমাম সাহেব তাকে থামিয়ে দিয়ে বাদীকে তার পাওনা নিজ পকেট থেকে দিয়ে দিলেন এবং বললেন : নাও তোমার প্রাপ্য, কখনো কোন মুসলিমকে কসম করতে বাধ্য করো না। এ ঘটনায় তিনি অত্যন্ত প্রভাবিত হলেন এবং সরাসরি মানসূরের কাছে গিয়ে বললেন: না, আমি এ কাজ করতে পারব না। এতে মানসূর খুব ক্রুদ্ধ হলেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁকে জেলে পাঠালেন।

কারাগারে কিছুদিন নীরবে অতিবাহিত করার পর তিনি মানসূরকে বললেন ঃ আমাকে এখানে দরস চালু রাখার অনুমতি দিন। তাঁকে অনুমতি দেওয়া হলো। তিনি এখানে পাঁচ বছর পুরাদস্তুর দরস দেন। বন্দীশালায় তাঁর সুখ্যাতি আরো বেড়ে যায়। ইমাম মুহাম্মদ শায়বানী (র) এখানেই ইমাম সাহেবের কাছে শিক্ষা লাভ করেন।

১৫০ হি. ৭৬৭ খ্রী. সনে তিনি কারাগারে ইন্তিকাল করেন। কারাগারে আবদ্ধ করার পরও তাঁর প্রভাব-প্রতিপত্তি ও জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাওয়ায় মানসূর ভীত-শঙ্কিত হয়ে বিষ প্রয়োগে তাঁকে হত্যা করে। ১৫ রজব ১৫০ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। বাগদাদের কাযী হাসান ইব্‌ন আম্মারাহ্ তাঁর গোসল দেন ও কাফন পরান। যোহরের পর তাঁর প্রথম নামাযে জানাযা অনুষ্ঠিত হয়। অগণিত লোক এতে শরীক হয়। পরে আসর পর্যন্ত আরো ছয়বার জানাযার নামায অনুষ্ঠিত হয়। এবং আসরের নামাযের পর তাঁর অসিয়ত অনুযায়ী খায়জরান কবরস্তানে দাফন করা হয়। দাফনের পর ২০ দিন পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত মানুষ তাঁর কবরে জানাযার নামায আদায় করেন। ৪৫৯ হিজরীতে সালজুকী সুলতান তাঁর কবরে একটি কুব্বা নির্মাণ করেন এবং এর সংলগ্ন একটি মাদ্‌রাসা ও একটি মুসাফিরখানাও তৈরী করেন। আজো বাগদাদে তাঁর মাযার এলাকা ইমামিয়া, আ'যমিয়া ও নু'মানিয়া নামে খ্যাত।

তিনি ছিলেন আপোষহীন ব্যক্তিত্ব। নীতির জন্য যে কোন ত্যাগ স্বীকার করা ছিল তাঁর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। কুফার উমাইয়্যা গভর্ণর ইয়াযীদ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন হুবায়রা এবং পরে আব্বাসী খলীফা মানসূর তাঁকে প্রধান কাযীর পদ দান করলে তিনি তা দৃঢ়তার সাথে প্রত্যাখ্যান করেন। এ কারণে তাঁকে দৈহিক শাস্তি ও কারাদণ্ড ভোগ করতে হয় এবং অবশেষে বিষপানে প্রাণ ত্যাগ করতে হয়। তিনি নির্যাতন ভোগ করেছেন, কারাগারে জীবন কাটিয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত মযলুম অবস্থায় দুনিয়া থেকে চির বিদায় নিয়েছেন, তবুও তিনি নীতির প্রশ্নে আপোষ করেন নি। যালিম ও স্বৈরাচারী শক্তির কাছে নতি স্বীকার করেন নি।

ইমাম আবূ হানীফা (র) তাঁর উস্‌তাদের নামানুসারে একমাত্র পুত্রের নাম রাখেন হাম্মাদ। তিনি প্রসিদ্ধ আলিম ছিলেন। পিতার আদর্শে অনুপ্রাণিত হাম্মাদ কখনো কোন সরকারী চাকুরী করেননি। শিক্ষাদান করতেন এবং নিজের ব্যবসার আয় দিয়ে জীবন-যাপন করতেন। ১৭৬ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন এবং কূফায় তাকে দাফন করা হয়।

খলীফা হারুন অর রশীদ একবার ইমাম আবূ ইউসূফকে (র) ইমাম আবূ হানীফা (র) সম্পর্কে কিছু বলতে বললে তিনি বলেন ঃ ইমাম আবূ হানীফা (র) ছিলেন একজন মহান চরিত্রের অধিকারী সম্মানিত ব্যক্তি। শিক্ষাদানের সময় ছাড়া প্রায় সবসময়ই নিশ্চুপ থাকতেন। তাঁকে দেখলে মনে হতো যেন কোন গভীর চিন্তায় মগ্ন আছেন। কোন প্রশ্ন করলে উত্তর দিতেন, নইলে চুপ থাকতেন। দানশীল ও হৃদয়বান ইমাম কখনো কারো কাছে কোন কিছু চাইতেন না। দুনিয়াদারদের থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখতেন এবং পার্থিব যশ ও গৌরব তুচ্ছ জ্ঞান করতেন। কখনো কারো নিন্দা করতেন না, আলোচনা এলে শুধু ভালই বলতেন। খুব বড় আলিম ছিলেন। সম্পদের ন্যায় জ্ঞান বিতরণে ছিলেন উদার।

ইব্‌ন হুবায়রা যখন তাঁকে সরকারী পদ প্রত্যাখ্যান করার কারণে দৈহিক নির্যাতন করছিল তখন ইমাম সাহেবের মা জীবিত ছিলেন। তিনি পুত্রের প্রতি এ নির্যাতনে নিদারুণভাবে মর্মাহত হন। ইমাম সাহেব তখন বলেছিলেন ঃ ওরা আমাকে যে ক্লেশ দিচ্ছে আমি তা কিছুই মনে করি না। তবে এতে আমার মা কষ্ট পাচ্ছেন, তাই আমি ব্যথিত।

ইমাম সাহেব প্রত্যহ ফজরের নামাযের পর দীর্ঘক্ষণ তিলাওয়াতে কুরআন ও নির্ধারিত অযীফা আদায় করতেন। তারপর আগন্তুকদের প্রশ্নের জবাব দিতেন। যোহরের নামাযের পর ঘরে যেতেন। দুপুরের আহারের পর কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিতেন। আসর থেকে মাগরিব পর্যন্ত লোকদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করতেন ও ব্যবসায় সংক্রান্ত বিষয়াদি তদারক করতেন। মাগরিবের পর থেকে এশা পর্যন্ত দরস দিতেন। এশার পর প্রায়ই মসজিদে থাকতেন এবং ফজর পর্যন্ত তাহাজ্জুদ ও অন্যান্য অযীফা আদায় করতেন। তিনি ছিলেন অত্যন্ত কোমল হৃদয়ের মানুষ। কারো দুঃখ-বেদনায় তিনি ব্যাকুল হয়ে পড়তেন। সাধ্যানুযায়ী মানুষের সাহায্য করতেন। বেশি বেশি কুরআন তিলাওয়াত করতেন। তিলাওয়াতের সময় তাঁর চোখ থাকত অশ্রুসিক্ত। নামাযে কিংবা নামাযের বাইরে যখনই আযাবের অথবা ধমকের কোন আয়াত তিলাওয়াত করা হতো তখন তাঁর ওপর এমন প্রভাব করতো যে, তিনি কাঁপতে থাকতেন ও চোখ দিয়ে অশ্রু বিগলিত হতো।

২. কর্ম

উস্‌তাদ হাম্মাদ (র) জীবিত থাকাকালীন অবস্থায় ইমাম সাহেব ইজতিহাদের স্তরে উপনীত হলেও তিনি কার্যত: তা করেননি। ১২০ হিজরীতে তাঁর ইন্তিকালের পর বাগদাদে তিনি উস্‌তাদের স্থলাভিষিক্ত হন। তিনি শিক্ষাদানের দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে

উপলব্ধি করলেন যে, মুসলিম মিল্লাতের জন্য শরীয়তের বিধি-বিধানের একটি সংকলন থাকা আবশ্যক। তখন পর্যন্ত লিখিত আকারে প্রয়োজনীয় বিধিমালা প্রণীত হয়নি। তিনি স্থির করলেন যে, কুরআন ও হাদীস থেকে মুসলমানদের দৈনন্দিন জীবনের মাসআলা সমূহ বের করে একত্রিত করবেন, যাতে প্রয়োজনের সময় সহজে সমস্যার সমাধানের নির্দেশ লাভ করা যায়। এ কাজ খুব সহজসাধ্য ছিল না। তিনি এ কাজ সম্পন্ন করার দৃঢ় সঙ্কল্প করলেন। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁকে মুসলিম মিল্লাতের এ দায়িত্ব পালনের যোগ্য করে প্রস্তুত করেছিলেন।

রিসালাতের যামানা ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যামানা থেকেই ফিক্হ ইসলামীর প্রচলন হয়। কুরআন ও হাদীস থেকে সাহাবায়ে কিরাম ফিক্হের প্রশ্নের উত্তর দিতেন। সাহাবাদের মধ্যে এ ব্যাপারে প্রসিদ্ধ ছিলেন হযরত আলী (রা), হযরত উসমান (রা) হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা), হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন মাসউদ (রা)। এদের মধ্যে হযরত আলী (রা) ছিলেন মাসআলা ইস্তিম্বাতের দিক দিয়ে অগ্রণী। হযরত উমর (রা) বলেন ঃ "আল্লাহ্ যেন এমন না করেন যে, কোন কঠিন মাসআলা আমাদের সামনে আসবে আর আলী (রা) তখন আমাদের মধ্যে থাকবে না।" হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ "কোন মাসআলায় আমি যরত আলী (রা)-এর ফাতওয়া পেলে অন্য কিছুর প্রয়োজন আছে বলে মনে করি না।"

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর সময়কাল পর্যন্ত উল্লিখিত সাহাবায়ে কিরাম ও অন্যান্য ফিক্হবিদদের মাধ্যমে কুরআন ও হাদীস থেকে অনেক মাসআলা সংগ্রহ করা হয়েছিল। কিন্তু তা ছিল অবিন্যস্ত ও অলিখিত। ইমাম আবূ হানীফা (র) চাইলেন সালফে সালিহীনের পথ ধরে পূর্ণাঙ্গ ফিকহ বিন্যস্ত করতে। তিনি এজন্য তাঁর শাগরিদদের মধ্য থেকে কয়েকজন বিজ্ঞ ও দক্ষ ব্যক্তির সমন্বয়ে একটি পরিষদ গঠন করলেন। যাঁদের তিনি এ দায়িত্বে নিয়োজিত করেছিলেন তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন কাযী আবূ ইউসুফ (র), দাউদ ত্বাই (র),মুহাম্মদ শায়বানী (র) ও যুফার (র)। এরা ১২১ হি. থেকে কাজ আরম্ভ করেন এবং ১৫০ হিজরীতে ইমাম সাহেবের মৃত্যু পর্যন্ত তা চালু রাখেন। এ সময়ের মধ্যে ফিক্হী মাসআলার এক সুবৃহৎ সংকলন তৈরি হয়ে যায়, যাতে ত্বাহারাতের অধ্যায় থেকে মীরাছের অধ্যায় পর্যন্ত শামিল করা হয়। এতে ইবাদতের মাসআলা ছাড়াও দিওয়ানী, ফৌজদারী দণ্ডবিধি, লাগান, মালগুজারী, শাহাদাত, চুক্তি, উত্তরাধিকার, অসিয়ত ইত্যাদি নানাবিধ বিষয় সংক্রান্ত আইন-কানুন সন্নিবেশিত হয়। ঐতিহাসিক সূত্রে এ সংকলনে মাসআলার সংখ্যা ১২ হাজারের অধিক। হারুন রশীদের বিশাল সাম্রাজ্যের সর্বত্র বিচার-আচার এর অনুকরণে করা হতো। তাঁর পরবর্তীকালেও এ পদ্ধতিই প্রচলিত ছিল। হানাফী ফিক্হ, কুরআন-হাদীসের আলোকে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক প্রয়োজনের নিরিখে প্রণীত বিধায় তা কালজয়ী হয়েছে। বর্তমানে বিশ্বের মুসলিম জনগোষ্ঠির অর্ধেকের বেশি ফিক্হ হানাফী অনুসরণ করেন। বিশেষ করে বাংলাদেশ, পাকিস্তান, ভারত, আফগানিস্তান, চীন, মধ্য এশিয়া, তুরস্ক,

ইরাক, সিরিয়ায় ফিক্‌হ হানাফী জনপ্রিয়। ইমাম আ'যম আবু হানীফা (র)-এর কর্ম-জীবনের উল্লেখযোগ্য অবদানের মধ্যে ফিক্‌হ শাস্ত্রের সংকলন ও বিন্যাস অন্যতম শ্রেষ্ঠ অবদান। মুসলিম মিল্লাত চিরদিন তাঁর এ অবদানের কথা কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করবে।

ইমাম আবু হানীফা (র)-এর উস্‌তাদের মধ্যে ৭ জন ছিলেন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবা এবং ৯৩ জন ছিলেন তাবেঈন। চরিতকারদের মতে তাঁর উস্‌তাদের সংখ্যা চার হাজারেরও অধিক। তিনি সে সময়কার যাবতীয় জ্ঞান আহরণ করেছিলেন। এমন কোন ক্ষেত্র ছিল না, যেখানে তিনি স্বচ্ছন্দে পদচারণা করতে পারতেন না। প্রকৌশলী ও প্রযুক্তিবিদদের মধ্যে তাঁর স্থান ছিল সর্বোচ্চে। বাগদাদকে মুসলিম সাম্রাজ্যের রাজধানীর উপযোগী করে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান চিরদিন ভাস্বর হয়ে থাকবে। জ্ঞান আহরণ ও বিতরণের ক্ষেত্রে তিনি যে নযীর স্থাপন করে গেছেন, তা রীতিমত বিস্ময়কর। ব্যবহারিক জীবনের জন্য ফিক্‌হী মাস্‌আলার সংগ্রহ সংকলন করে একদিকে যেমন তিনি মুসলিম মিল্লাতের একটি অভাব পূরণ করেন, ঠিক তেমনি ইলমে কালামের ভিত রচনা করে আর একটি প্রয়োজন মিটান। ফিক্‌হের ক্ষেত্রে তাঁর পদ্ধতি হানাফী মাযহাব এবং কালামের ক্ষেত্রে মাতুরীদিয়া মাযহাব হিসাবে খ্যাত। ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, সকল মানুষ তিন জনের অনুগামী। তাফসীরে মুকাতিল ইব্‌নে সুলাইমানের; কবিতায় যুহাইর ইব্‌ন আবূ সুলমার এবং কালামের ক্ষেত্রে আবূ হানীফা (র)-এর। (ইব্‌ন খাল্লিকান ঃ অফাইয়াত ৪/৩৪১)। ইব্‌ন কাছীর 'আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া' গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, ইমাম শাফিঈ বলেছেন ঃ "যে কেউ ফিক্‌হ জানতে ইচ্ছা করে, সে আবূ হানীফা (র)-এর মুখাপেক্ষী।" (১০/১০৭)

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর প্রতি আরোপিত গ্রন্থের সংখ্যা ২০টি। এর অধিকাংশই পৃথিবীর বিভিন্ন মিউজিয়ামে ও গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপি আকারে সংরক্ষিত। কয়েকটি মুদ্রিত হয়েছে। কয়েকটির একাধিক শরাহ রচিত হয়েছে। গ্রন্থগুলির বেশীর ভাগই আকাইদ সংক্রান্ত। এগুলোর নাম ও অবস্থান ঃ

১. আল-ফিক্‌হুল আকবর
২. আল-ফিক্‌হুল আবসাত
৩. কিতাব আল আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম
৪. আল অসিয়্যা
৫. আর রিসালা
৬. মুসনাদ আবু হানীফা
৭. অসিয়্যা ইলা ইবনিহি হাম্মাদ
৮. অসিয়্যা ইলা তিলমিযিহি ইউসুফ ইব্‌ন খালিদ
৯. অসিয়্যা ইলা তিলমিযিহি আল ক্বাযী আবী ইউসুফ
১০. রিসালা ইলা উসমান আল বাত্তি
১১. আল কাসীদা আল কাফিয়া (আননু'মানিয়া)

১২. মুজাদালা লি আহাদিদ দাহরীন
১৩. মা'রিফাতুল মাযাহিব
১৪. আল যাওয়াবিত আস সালাসা
১৫. রিসালা ফিল ফারাইয
১৬. দু'আউ আবী হানীফা
১৭. মুখাতাবাতু আবী হানীফা মা'আ জা'ফর ইব্‌ন মুহাম্মদ
১৮. বা'আয ফাতাওয়া আবী হানীফা
১৯. কিতাবুল মাকসূদ ফিস্ সারফ
২০. কিতাবু মাখারিজ ফিল হিয়াল

১. আল-ফিক্‌হুল আক্‌বর

এ গ্রন্থটির কয়েকটি রিওয়ায়াত রয়েছে। তার মধ্যে দুটি প্রসিদ্ধ। ১. হাম্মাদ ইব্‌ন আবী হানীফা (র) এবং ২. আবূ মূতী' আল বলখী। শেষোক্তটি আল-ফিক্‌হুল আব্‌সাত নামে পরিচিত। ফিক্‌হুল আকবরের অসংখ্য কপি পৃথিবীতে বড় বড় মিউজিয়ামে ও কুতুবখানায় পাণ্ডুলিপি আকারে আছে। তাছাড়া বিভিন্ন স্থান থেকে বহুবার ছাপা হয়েছে। এর আছে বহু তরজমা ও শরাহ। ১২৮৯ হিজরীতে দিল্লী থেকে এর উর্দু তরজমা এবং ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দে লাহোর থেকে এর পাঞ্জাবী তরজমা প্রকাশিত হয়। জার্মান পণ্ডিত ভন এস জে. হেল ১৯১৫ খ্রিস্টাব্দে এর অনুবাদ জার্মান ভাষায় প্রকাশ করেন। ১৭টির অধিক শরাহ ও অসংখ্য পাদটীকা সম্বলিত কপি প্রকাশিত হয়েছে। যেমন ঃ

১. আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ আল বযদাভী (মৃ. ৪৮২/১০৮৯). সম্পাদিত লর্ড ষ্টেনলী, লণ্ডন ১৮৬২।

২. আকমাল উদ্দীন মুহাম্মদ ইব্‌ন মাহমুদ ইব্‌ন আহমদ আল-বাবারতী (মৃ. ৭৮৬/১৩৮৪)। ইস্তাম্বুল ও কায়রোর প্রসিদ্ধ কুতুবখানা সমূহে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত।

৩. ইলিয়াস ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আস-সীনুবী (মৃ. ৮৯১/১৪৮৬)। তাশখন্দ ও ইস্তাম্বুলের কুতুবখানায় সংরক্ষিত।

৪. আবুল মুনতাহা আহমদ মুহাম্মদ আল মুগনীসুয়ী (৯৩৯/১৫৩২) বার্লিন, লন্ডন, ক্যাম্ব্রিজ, দামিস্ক, কায়রো, ইস্তাম্বুল প্রভৃতি লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত।

৫. মোল্লা আলী আল-কারী আল হারাভী (১০১৪/১৬০৫)। তাশখন্দে ১৩১২ হি. কায়রোতে ১৩২৩ হি., কানপুরে ১৩২৭ হি. এবং কায়রোতে ১৯৫৫ খ্রীস্টাব্দে প্রকাশিত। পৃথিবীর বড় বড় গ্রন্থাগারে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত।

৬. আলাউদ্দীন আলী আল বুখারী, তিনি উলুগ বেককে উৎসর্গ করেন। (শাসনকাল ৮৫০/১৪৪৭-৮৫৩/১৪৪৯)। বাঁকীপুর ও রামপুরে সংরক্ষিত।

৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ খতীবজাদা। ৯২০/১৫১৪তে লিখিত। ইস্তাম্বুল।

৮. মুহাম্মদ ইব্‌ন বাহাউদ্দীন ইবন লুৎফুল্লাহ্ আল-বায়রামী (৯৫৬/১৫৪৯)। কায়রো, ইস্তাম্বুল।

১০. আলী ইব্‌ন মুরাদ আল উমরী আল মোসেলী (১১৪৭/১৭৩৪)। লন্ডন, ইস্তাম্বুল।

১১. আবুল ফাতাহ্‌ উসমান আশ শাফিঈ। এশিয়াটিক মিউজিয়াম, বতরুমবুর্গ।

১২. মুঈনুদ্দীন আবুল হাসান আতা উল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল কারশাতী। কাজান, ১৮৯০ইং।

১৩. আবদুল কাদের সালহাতী। হায়দরাবাদ, ১২৯৮ হি.।

১৪. আন্‌ নামীহিয়ী আল-ফাহিমী। রামপুর।

১৫. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হাসান আল-ইশকুদরাভী (১২৬০/১৮৫৪)। ইস্তাম্বুল।

১৬. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন হুসসাম আল জারমিয়ানী (১০১৬/১৬০৭)। ইনি কবিতায় অনুবাদ করেন। ১০৯৯/১৬৮৮তে মীর অহীদী তা তুর্কী ভাষায় তরজমা করেন এবং পরে তা ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত হয়।

১৭. আবূ তায়্যেব হামদান ইব্‌ন হামযা। ইস্তাম্বুল ও প্যারিস।

২. আল-ফিক্‌হুল আব্‌সাত

আবুল মূতী' আল-হাকাম ইব্‌ন আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন সালামা (১৯৯/৮১৪), ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর শাগরিদ, তিনি ইমাম সাহেব-এর থেকে রিওয়ায়েত করেছেন। কায়রো, লাইডেন, ইস্তাম্বুলে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত। কায়রোতে ১৩০৭ ও ১৩২৪ হি. প্রকাশিত। মুহাম্মদ যাহেদ আল কাওছারী ১৩৬৮ হি. কায়রোতে পুন: প্রকাশিত। এর কয়েকটি শরাহ রয়েছে।

১. ইব্‌রাহীম ইব্‌ন ইসমাঈল আল-মুলতী। এটি ইমাম আবুল মানসূর আল মাতুরীদির প্রতিও অর্পিত। ১৩২১ হি. হায়দরাবাদে প্রকাশিত। বাঁকীপুর ও ইস্তাম্বুলে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত।

২. আতা ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ আল মুযাজানী। ৬৮৭/১২৮৮ এর পূর্বে লিখিত। ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত।

৩. কিতাবুল আলিম ওয়াল মুতাআল্লিম

ইমাম সাহেবের শাগরিদ আবুল মুকাতিল হাফস ইব্‌ন সালম আল সামারকান্দী (২০৮/৮২৩) রিওয়ায়াত করেন। কায়রো, রামপুর, ইস্তাম্বুল, লাইডেন ইত্যাদি স্থানে সংরক্ষিত। ১৩৪৯ হি. হায়দরাবাদে প্রকাশিত। মুহাম্মদ যাহেদ আল-কাওছারী ১৩৬৮ হি. কায়রোতে প্রকাশ করেন। আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান ইব্‌ন আল-ফুরাক (৪০৬/১০১৫)-এর শরাহ লিখেন। ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত।

৪. আল অসিয়্যাত

এ নামের কয়েকটি রচনাই ইমাম সাহেবের প্রতি আরোপিত। ইসলামের মৌলিক বিষয় সম্বলিত তাঁর অন্তিম অসিয়্যাত এতে রয়েছে। দু'টি রিওয়ায়াতে এটি পাওয়া যায়। ইসকুরিয়াল, লাইডেন, লন্ডন, বার্লিন, কায়রো, ইস্তাম্বুল, রামপুর, বাঁকীপুর, কাবুল, হায়দারাবাদ ইত্যাদি স্থানে সংরক্ষিত। ১৯৩৬ খ্রি, কায়রোতে প্রকাশিত। ১৯৬২ খ্রি. তুর্কী ভাষায় অনূদিত। এর চারটি শরাহ হয়েছে।

১. মুহাম্মদ ইব্ন মাহমুদ আল বাবারতী (৭৮৬/১৩৮৪)। মানচেষ্টার, ইস্তাম্বুল প্যারিস ইত্যাদি স্থানে সংরক্ষিত।

২. মোল্লা হোসাইন ইব্ন ইস্কান্দার আররুমী আল হানাফী (১০৮৪/১৬৭২), 'আল জাওয়াহিরুল মুনিফা' নামে শরাহ লিখেন। ১৩২১ হি. হায়দরাবাদে প্রকাশিত। ইস্তাম্বুল, আল আযহার, বতরুমবার্গ, হায়দরাবাদে সংরক্ষিত।

৩. ইমাম আল হুসূনেয়ী, 'যহুরুল আতীয়া' নামে ১০৫৬/১৬৪৬-তে এর শরাহ লিখেন। ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত।

৪. ইব্রাহীম ইব্ন হাসান (১২৬০/১৮৪৪)। ১২৬০ হি. ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত।

৫. আর রিসালা

এ নামের কয়েকটি পুস্তক ইমাম সাহেবের প্রতি আরোপিত।

১. রিসালা ইলা উসমান আল বাত্তি; এতে ইমাম সাহেবকে মুরজিয়া বলে অভিযুক্ত করার অভিযোগ খণ্ডন করা হয়েছে। উসমান ইব্ন সুলাইমান ইব্ন জুরমুয (১৪৩/৭৬০) এ অভিযোগ করলে তার জবাব দেয়া হয় এ রিসালায়। কায়রো, ইস্তাম্বুল, লাইডেনে সংরক্ষিত। ১৩৬৮ হি. কায়রোতে আল-কাওছারী কর্তৃক প্রকাশিত।

২. রিসালাতুন উখ্রা ইলা উসমান আল-বাত্তি; ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত।

৩. রিসালা ফিল ফারাইয; ইস্তাম্বুলে সংরক্ষিত।

৬. অসিয়্যা ইলা ইবনিহি হাম্মাদ

ইমাম সাহেব স্বীয় পুত্র হাম্মাদ (র)-কে এ অসিয়্যাত লিখেছেন। উসমান ইব্ন মুস্তাফা ১০৫৭/১৬৪৯তে 'যুবদাতুন নাসায়েহ্' নামে এর শরাহ লিখেন। বৃটিশ মিউজিয়াম, ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরী, আল আযহার ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ কুতুবখানায় এর পাণ্ডুলিপি বিদ্যমান।

৭. অসিয়্যা ইলা তিলমিযিহী ইউসুফ ইব্ন খালিদ আল-বাসরী

এ পুস্তকের শরাহ রচনা করেন আহমদ ইবন মুহাম্মদ কিইয়াযারী ১২০০ হিজরীতে। বার্লিন মিউজিয়ামে তা সংরক্ষিত। ইস্তাম্বুল, দামিস্ক, মিউনিখ ও কায়রোতে সংরক্ষিত।

৮. অসিয়্যা ইলা তিলমিযিহি আলক্বাযী আবী ইউসুফ ইব্ন ইব্রাহীম (১৮২/৭৯৮)।

পৃথিবীর বিভিন্ন মিউজিয়াম ও কুতুবখানায় এ পাণ্ডুলিপিটি মওজুদ আছে। এতে ইমাম সাহেব আকাইদের অনেক গুঢ় তত্ত্ব সন্নিবেশ করেছেন। ফিক্হী ও নৈতিক নসীহত ছাড়াও এতে অনেক ব্যক্তিগত বক্তব্য রয়েছে।

৯. আল-কাসীদা আল কাফীয়া (আন নু'মানিয়া) ফি মাদহিন নাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম।

১২৬৮ হি. ইস্তাম্বুলে প্রকাশিত। ইব্রাহীম ইব্ন মুহাম্মদ ১২৭৬ হি, তুর্কী ভাষায় কবিতায় ও গদ্যে অনুবাদ করে ইস্তাম্বুলে প্রকাশ করেন। মুহাম্মদ আ'যম ইব্ন মুহাম্মদ

১৮৯৭ খ্রি. 'রাহমাতুর রহমান' নামে এর উর্দু অনুবাদ দিল্লী থেকে প্রকাশ করেন। কায়রো, ইস্তাম্বুল ও হাইডেলবার্গে এর পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত।

১০. মুজাদালা লি আহাদিদ দাহ্‌রীন

এ পাণ্ডুলিপিটি কায়রোর দারুল কুতুবে সংরক্ষিত। এখনো এর কোন মুদ্রণ হয়েছে বলে জানা নেই।

১১. কিতাব মা'রিফাত আল মাযহাব

ভারতের রামপুরে এবং বতরুমবার্গের মিউজিয়ামে পাণ্ডুলিপি সংরক্ষিত।

১২. আল যাওয়াবিত আস সালাসা

'আল অসূল ইলাল কানযিল আকবর ওয়া ইলা মাহ্‌য়া আল আনফা মিন আল কিবরীতিল আহমার' নামক এর একটি শরাহ্‌ ইস্তাম্বুলের জারিয়াত কুতুবখানায় সংরক্ষিত। এর রচয়িতার নাম জানা নেই। এটি ফিকহের উপর রচিত।

১৩. দু'আউ আবী হানীফা

ভারতের বাঁকীপুরে ২৬/৩১ নং ২৭৯১/৫তে সংরক্ষিত।

১৪. মুখাতাবাতু আবী হানীফা মা'আ জা'ফর ইবন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ রিযা (মৃ. ১৪৮/৭৬৫)।

মিসরের আলেকজান্দ্রিয়ার মিউনিসিপ্যাল কুতুবখানায় সংরক্ষিত।

১৫. বা'যু ফাতাওয়ায়ি আবী হানীফা

মুহাম্মদ ইব্‌ন হাসান আশ্‌ শায়বানীর রিওয়ায়াতে ইমাম সাহেব রচিত এ পাণ্ডুলিপিটি প্যারিসে জাতীয় মিউজিয়ামে সংরক্ষিত।

১৬. কিতাবুল মাখারিজ ফিল হিয়াল

১৯৩০ খ্রিস্টাব্দে জোসেফ শাখত ইস্তাম্বুল ও কায়রোতে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপির ভিত্তিতে লিবতিজ থেকে প্রকাশ করেন। এটি ইমাম মুহাম্মদ শায়বানীর রিওয়ায়াতে বর্ণিত।

১৭. কিতাব আল মাকসূদ ফিস্‌ সারফ

ব্রোকেলমান ও ফুয়াদ মিজগীন উল্লেখ করেন যে, এ পাণ্ডুলিপিটি ইস্তাম্বুলের বহু কুতুবখানায় সংরক্ষিত আছে। তারা আরো বলেন যে, ইমাম সাহেবের প্রতি এটি পরবর্তী সময় আরোপিত।

১৮. মুসনাদু ইমাম আ'যম আবী হানীফা

১৫টি ভাষ্য তথা রিওয়ায়াতে এটি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রসিদ্ধ মিউজিয়াম ও কুতুবখানায় সংরক্ষিত। নিম্নে ভাষ্য সমূহ সংক্ষেপে দেওয়া গেল ঃ

১. ইমাম আবূ ইউসুফ; কায়রো ও ইস্তাম্বুল।

২. আল হাসান ইব্‌ন যিয়াদ আল্‌লুলুই (২০৪/৮১৯); বাগদাদ।

৩. আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্‌ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইয়া'কুব ইব্‌ন আল-হারিস আল-বুখারী (মৃ. ৩৪০/৯৫০); বার্লিন, কায়রো, ইস্তাম্বুল ও দামিস্ক।

৪. আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্‌ন ইব্‌রাহীম ইব্‌ন আলী ইব্‌ন 'আসিস যাযান আল মুকরী (মৃ. ৩৮১/৯৯১); ইস্তাম্বুল।

৫. আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইস্‌হাক ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন মানদাহ (মৃ. ৩৯৫/১০০৫); বার্লিন, ইস্তাম্বুল।

৬. আবূ নঈম আহমদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন আহমদ আল-ইস্পাহানী (মৃ. ৪৩০/১০৩৮); ইস্তাম্বুল।

৭. আবূ আবদুল্লাহ্ আল-হুসাইন ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন খুসরু আল-বলখী (মৃ. ৫২০/১১২৬); বার্লিন, ইস্তাম্বুল।

৮. হুমামুদ্দীন আলী ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন মক্কী আররাযী (মৃ. ৫৯৮/১২০১) ; ইস্তাম্বুল।

৯. মূসা ইব্‌ন যাকারিয়া ইব্‌ন ইব্‌রাহীম আল-হাসকাফী (মৃ.৬৫০/১২৫২); আলেকজান্দ্রিয়া, বাঁকীপুর, বার্লিন, ইস্তাম্বুল। ইস্তাম্বুলের বায়েজিদ কুতুবখানায় সংরক্ষিত কপি ১৩১৬ হিজরীতে হিন্দুস্তানে, ১৩২৭ হিজরীতে কায়রোতে এবং ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দে আলেপ্পোতে প্রকাশিত হয়। বার্লিন ও বাঁকীপুরে সংরক্ষিত কপি ১৩০০ হিজরীতে হিন্দুস্তানে ১৩১২ হিজরীতে লাহোরে প্রকাশিত হয়।

১০. আবূল মুয়ীদ মুহাম্মদ ইব্‌ন মাহমুদ আল-খুয়ারযিমি (৬৪৫/১২৪৭); ইস্তাম্বুল, আলেকজান্দ্রিয়া, কায়রো, বাঁকীপুর, বার্লিন, দামিস্ক। ১৩৩২ হিজরীতে হায়দরাবাদে প্রকাশিত।

আবুল বাকা মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন যিয়া আল-হানাফী (মৃ.৮৫৪/১৪৫০) এর সংক্ষেপন করেন। তিনি তার শরাহ্‌র নাম দেন আল-মুসতানাদ মুখতাসার আল-মুসনাদ'। এটি ইস্তাম্বুলের বিভিন্ন কুতুবখানায় সংরক্ষিত।

১১. কাসিম ইব্‌ন কুতলুবুগা আল-হানাফী (মৃ. ৮৭৯/১৪৭৪); বার্লিন, ইস্তাম্বুল।

১২. সায়ীদ ইব্‌ন ঈসা ইব্‌ন মুহাম্মদ আস্-সা'আলিবী ইস্তাম্বুল।

১৩. মুহাম্মদ আবিদ ইব্‌ন আহমদ আল-সিন্ধী (মৃ. ১২৬৭/১৮৪১); ফিক্‌হী অধ্যায় অনুযায়ী বিন্যস্ত। ইমাম বুখারীর 'কিতাব আল আদব আল মুফরাদ'-এর হাশিয়ায় ১৩০৪ হিজরীতে হিন্দুস্তানে প্রকাশিত। ১৩১৮ হি. লক্ষ্ণোতে ও ১৩২৭ হি. কায়রোতে প্রকাশিত।

১৪. মুহাম্মদ হাসান লাক্ষ্ণৌভী, ১৩০৯-০১৩১৬ হি.।

১৫. তাশখন্দ ও কায়রোর দারুল কুতুবে আরো কয়েকটি মুসনাদের সন্ধান পাওয়া যায়। তবে এসবের প্রস্তুতকারীদের পরিচয় নেই।

ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর ওপর আরোপিত এ মুসনাদের অনেক শরাহ্ রয়েছে। তারমধ্যে কয়েকটির পরিচয় ঃ

১. 'তানভীরুস সানাদ ফী ঈযাহি রামমিল মুসনাদ' রচয়িতা উসমান ইব্‌ন ইয়াকুব ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন মুস্তাফা আল-কামাসী (১১৬৬/১৭৫২); ইস্তাম্বুল।

২. 'কিতাব যিকর মান রাওয়া আনহু আবূ হানীফা'। রচয়িতা অজ্ঞাত। আঙ্কারা, ইস্তাম্বুল।

৩. 'কিতাব মাশিখাত আবী হানীফা'। রচয়িতা আবু উমাইয়্যা মারওয়ান ইব্‌ন সওবান; কায়রো।

৪. 'কিতাবুল আরবাঈন আল-মুখতারাত মিন হাদীসিল ইমাম আবী হানীফা'। রচয়িতা ইউসুফ ইব্‌ন আবদিল হাদী (৯০৯/১৫০৩), দামিস্ক, বার্লিন।

৫. 'আওয়ালী আল-ইমাম আবী হানীফা' সংগৃহীত আদদিমিস্কি।

৬. 'মুসনাদ ইমাম আযম' উস্‌তাদ খুরশিদ আলম, দেওবন্দ, উর্দু অনুবাদ।

ইমাম আযম আবূ হানীফা (র) ফিক্‌হ শাস্ত্রের ক্ষেত্রে তাঁর অবদানের পাশাপাশি আকাইদের ক্ষেত্রে এসব গ্রন্থ রচনা করে মৌলিক ভিত প্রস্তুত করে যান। পরবর্তীকালে তাঁর অনুসারীরা এর ওপর ভিত্তি করে ইল্‌ম কালামের পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটান। ইমাম আবূ মানসূর আল মাতুরীদী (৩৩৩/৯৪৪) ইমাম সাহেবের পদাঙ্ক অনুরণ করে আকাইদের ক্ষেত্রে যে পদ্ধতির প্রবর্তন করেন, তা যদিও 'মাযহাবে মাতুরিদীয়া' নামে খ্যাত, তবুও প্রকৃতপক্ষে তা ইমাম সাহেবেরই প্রদর্শিত মাযহাব। ইমাম মাতুরীদি নতুন কিছুই করেন নি। বরং তিনি ইমাম আবূ হানীফা (র)-এর মত ও পদ্ধতির ব্যাখ্যা দিয়েছেন এবং তা বিন্যস্ত করেছেন। ইমাম আবুল মানসূর আল-মাতুরীদি তাঁর বিখ্যাত 'কিতাব আত তাওহীদ', 'কিতাব তাভীলাত আহলে আল সুন্নাহ্' 'কিতাব মা'খায আল শরিয়া ফি উসূল আলদীন', 'কিতাব আল উসূল', 'কিতাব আল মাকালাত' প্রভৃতি গ্রন্থে ইমাম আবূ হানীফা (র) কর্তৃক নির্দেশিত আকাইদের বিষয় সমূহের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রদান করে একটি অবকাঠামো নির্মাণ করেন, যা আকাইদের ক্ষেত্রে কালজয়ী মাযহাব হিসাবে স্বীকৃত। এখানে ইমাম আবূ হানীফা (র) ও ইমাম আবূ মানসুর আল-মাতুরীদী (র)-এর সম্পর্ক নির্দেশের নিমিত্ত নিম্নে তিনটি ছক দেওয়া গেল ঃ

১

ইমাম আবূ হানীফা (মৃ. ১৫০/৭৬৭)

↓

ইমাম মুহাম্মদ আশ্‌ শায়বানী (মৃ. ১৮৯/৮০৪)

↓

মুহাম্মদ ইব্‌ন মুকাতিল আররাযী (মৃ. ২৪৮/৮৬২)

↓

আবূ মান্‌সূর আল-মাতুরীদী (মৃ. ৩৩৩/৯৪৪)

২

ইমাম আবূ হানীফা (র)

↓

ইমাম মুহাম্মদ শায়বানী ↓ | ইমাম আবূ ইউসূফ (মৃ. ১৮২/৭৯৮) ↓

↓

ইমাম আবূ হানীফা (র)

↓

ইমাম মুহাম্মদ শায়বানী ↓ | ইমাম আবূ ইউসূফ (মৃ. ১৮২/৭৯৮) ↓

↓

আবূ সুলাইমান মুসা আল জুযাদানী

↓

আবূ নসর আহমদ, আয়্যাযী, ↓ | নুসাইর বলখী, ↓ | আবূ বকর জুযাজানী ↓

↓

আল মাতুরীদী

৩

ইমাম আবূ হানীফা (র)

↓

আবূ মূতী' হাকাম বলখী (মৃ. ১৯৯/৮১৪) ↓ | আবূ মুকাতিল হাফস সমরকন্দী (মৃ. ২০৮/৮২৩) ↓

↓

আল-মাতুরীদী

ইমাম আবু হানীফা (র) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত পদ্ধতিকে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন ইমাম আল-মাতুরীদী। পরে তাঁর যোগ্য শাগরিদ ও তাদের অনুগামীরা এ পথে প্রভূত উৎকর্ষ সাধন করেন। এখানে তার কিছু উল্লেখ করা গেল ঃ

১. ক্বাযী আবুল কাসিম হাকিম সমরকন্দী (মৃ. ৩৪০/৯৫১), তাঁর রচিত 'আল মাওয়াদ আল আ'যম' মাতুরীদীর শিক্ষার দর্পণ হিসাবে স্বীকৃত। বহুবার এটি প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া 'আকীদাতুল ইমাম', 'শরহু ফিক্হিল আক্বর' প্রভৃতি গ্রন্থও তিনি রেখে গেছেন।

২. ইমাম আবুল হাসান আলী ইবন সাইদ আল রুসতাগফিনী, কিতাব ইরশাদ আল মুহ্তাদী, কিতাব ফিল খিলাফা ও 'কিতাব যাওয়াইদ ওয়া আল ফাওয়াইদ ফি আনওয়াইল উলুম' রচনা করেন।

৩. ফখরুল ইসলাম আবুল হাসান আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আবদুল করীম বাযদাভী (মৃ. ৪৮২/১০৮৯), তিনি প্রসিদ্ধ 'উলুম আল-বাযদাভী' গ্রন্থের প্রণেতা।

৪. আবুল মু'ঈন মাইমূন ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন মুহাম্মদ আল-মুকহুলী আন্ নাসাফী (৫০৮/১১১৪), তাঁর রচিত গ্রন্থের মধ্যে প্রসিদ্ধ হলো ঃ বাহরুল কালাম, তাবসিরাতুল আদিল্লা, আত্ তামহীদ লি কাওয়াদ আত্ তাওহীদ।

৫. নাজমুদ্দীন আবু হাফস উমার ইবন মুহাম্মদ ইবন আহমদ আন নাসাফী আস-সামারকান্দী-মুফ্তীউস্ সাকালাইন (মৃ. ৫৩৭/১১৪২)। তাঁর রচিত গ্রন্থাবলীর মধ্যে রয়েছে : 'উমদা 'আকীদাতু আহল আল সুন্নাহ্ ওয়া আল জামাআ'। এর অনেক শরাহ্ লেখা হয়েছে, যার মধ্যে সায়াদুদ্দীন তাফতাযানীর শরাহ্ সর্বাধিক প্রসিদ্ধ। এ ছাড়া শতাধিক গ্রন্থের রচনা তাঁর প্রতি আরোপিত।

৬. আলাউদ্দীন আবূ বকর মুহাম্মদ ইব্ন আহমদ আবী আহমদ সমরকন্দী (৫৪০/১১৪৫)। তিনি ইমাম মাতুরীদীর তা'ভীলাতের শরাহ্ লিখেন, যার পাণ্ডুলিপি বিভিন্ন মিউজিয়াম ও কুতুবখানায় সংরক্ষিত। তিনি 'তুহফাতুল ফুকাহা' শীর্ষক একটি ফিক্হী সংকলন তৈরী করে রেখে গেছেন।

৭. নছরুল হক নুরুদ্দীন আহমদ ইব্ন মাহমুদ সাবূনী (৫৮০/১১৮৫) বিদায়া, হিদায়া, উমদা-শীর্ষক কয়েকখানা মূল্যবান গ্রন্থ কালাম ও উসূল বিষয়ে রচনা করেছেন।

৮. হাফিয উদ্দীন আবুল বারাকাত আবদুল্লাহ্ ইব্ন আহমদ ইব্ন মাহমূদ নাসাফী (৭১০/১৩১০) প্রসিদ্ধ আল-মাদারিক গ্রন্থের প্রণেতা। এ ছাড়া তিনি কানযুদ দাকাইক, আল-ওয়াফী, আল-উমদা, আল-মানার ইত্যাদি গ্রন্থও রচনা করেন।

৯. আবুল হাসান আলী ইব্ন মুহাম্মদ ইব্ন আলী, যিনি 'সাইয়েদ শরীফ জুরজানী' নামে খ্যাত, অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। তাঁর সর্বাধিক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ হলো 'শরহুল মাওয়াকিফ'। 'আত্ তা'রীফাত' তাঁর একটি অনবদ্য অবদান।

এসব মনীষীরা ও তাঁদের মতো অনেকে ইমাম আবূ হানীফার প্রদর্শিত পথে আকাইদ ও ফিক্হের ক্ষেত্রে মুসলিম মিল্লাতের জন্য রেখে গেছেন সিরাতে মুস্তাকিমে চলার

সুস্পষ্ট পথনির্দেশ। এরা সবাই ছিলেন তাঁদের সমকালীন সময় বিদ্যা ও জ্ঞানে অতুলনীয়। তবুও তাঁরা ইমাম আবূ হানীফা (র) কর্তৃক নির্দেশিত মূল ভিতের বিপরীতে কোন নতুন সংযোজন বা বিয়োজন করেন নি। তাঁরা শুধু যুগোপযুগী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ দিয়েছেন।

ইমাম আবূ হানীফা (র) সম্পর্কে লিখিত কয়েকটি গ্রন্থ ঃ

১. আবূ ইউসূফ ইয়া'কূব ইব্‌ন ইবরাহীম (মৃ.১৮২/৭৯৮); ইখতিলাফ আবী হানীফা ওয়া আবী লাইলা। আবূল ওয়াফা আফগানীর টীকাসহ ১৩৫৭ হিজরীতে কায়রোতে প্রকাশিত।

২. আবূ বকর ইব্‌ন আবী শায়বা (মৃ. ২৩৫/৮৪৯): রদুদ আলা আবী হানীফা। মুহাম্মদ যাহেদ আল-কাওছারী ১৩৬৫ হিজরীতে কায়রোতে প্রকাশ করেন।

৩. আবুল আব্বাস আহমদ ইব্‌ন সালত আল হিম্মানী (মৃ. ৩০২/৯১৪): ফসলুন ফি মানাকিবি আবী হানীফা' কায়রো।

৪. 'মাকাম আবী হানীফা ইনদাল মুলুক', রচয়িতা অজ্ঞাত।

৫. আবুল হুসাইন আহমদ ইবন মুহাম্মদ আল কুদূরী : নব্‌যাতুন মিন মানাকিব আবী হানীফা। ইস্তাম্বুল।

৬. আবূ আবদূল্লাহ্ হুসাইন ইব্‌ন আলী ইব্‌ন মুহাম্মদ (মৃ. ৪৩৬/১০৪৪): মানাকিবু আবী হানীফা। ইস্তাম্বুল, কায়রো।

৭. আবূ মুহাম্মদ আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন হুমাইদ নাসেহী (মৃ. ৪৪৭/১০৫৫): মুখতালাফ বাইনা আবী হানীফা ওয়া আশ্ শাফীঈ। ইস্তাম্বুল।

৮. আবূ বকর উতাইক ইব্‌ন দাউদ আল ইয়ামনী (৪৬০/১০৬৮): কিতাব আল বয়ান ওয়া আল-বুরহান ফি জুমাল মিন ফাযাইল আল-ইমাম আল-আ'যম। ইস্তাম্বুল।

৯. আবূ বকর আহমদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন সাবিত আল-খাতিব আল-বাগদাদী (মৃ. ৪৬৩/১০৭১): মানাকিব আল-ইমাম আল-আ'যম। ইস্তাম্বুল।

১০. আবূল কাসিম আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ আম্ মা'দী : ফাযাইল আবী হানীফা। দামিস্ক, কায়রো।

১১. আল মুওয়াফ্‌ফিক ইব্‌ন আহমদ ইব্‌ন ইসহাক আল মক্কী আল খুয়ারযিমী (মৃ. ৫৬৮/১১৭২): মানাকিব আল ইমাম আবী হানীফা। ১৩২১ হিজরীতে হায়দারাবাদে প্রকাশিত। তাকীউদ্দীন ইয়াহইয়া ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ আল-কিরমানী (মৃ.৮৩৩/৪৩০)-এর সংক্ষেপন করেন।

১২. আবুল হাসান দিনওয়ারী : মানাকিব আবী হানীফা ওয়া আখবার আসহবিহী। ইস্তাম্বুল, কায়রো।

১৩. মাহমুদ ইব্‌ন মানসূর ইব্‌ন আবিল ফযল : ফসল আলা তাকদীম মাযহাব আবী হানীফা। ইস্তাম্বুল।

১৪. আবুল আজদ মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আবদিস সাত্তার আল ইমাদী আল কুরদী (মৃ. ৫৪২/১২৪৪) : আর রদ ওয়াল ইন্তিসার লি আবী হানীফা ইমাম ফুকাহা আল

আমসার; আল ফাওয়ায়েদ আল মুহিম্মা ফিয্ যাবেব আন আবী হানীফা। বার্লিন, ইস্তাম্বুল।

১৫. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ নকীব (মৃ. ৭৪৫/১৩৪৪) : মানাকিব আবী হানীফা। বুরছা, ইস্তাম্বুল।

১৬. মুহাম্মদ ইব্‌ন আহমদ ইবন উসমান যাহাবী (৭৪৮/১৩৪৮) : হায়দারাবাদ।

১৭. মুহাম্মদ ইব্‌ন মাহমুদ আকমাল উদ্দীন আল বাবারতী (৭৮৬/১৩৮৪) : আর রিসালা আন নাদারা লি মাযহাব আল ইমাম আল আ'যম আবী হানীফা। ইস্তাম্বুল, কায়রো।

১৮. ইয়াহইয়া ইব্‌ন ইবরাহীম ইব্‌ন মুহাম্মদ সালমানী : মানযিল আল আইয়েম্যা আল আরবাআ....। ইস্তাম্বুল।

১৯. মুহাম্মদ ইব্‌ন মুহাম্মদ আল কুর্দী আল বায্‌যাবী (মৃ. ৮২৭/১৩২৪) মানাকিবু আবী হানীফা। ইস্তাম্বুল, বুরছা, কায়রো, হায়দরাবাদ। ১৩২১ হিজরীতে হায়দরাবাদে প্রকাশিত।

২০. আবদুর রহমান ইব্‌ন আবী বকর আস্ যাবুতী (মৃ. ৯১১/১৫০৫): তাবয়ীয আস সাহীফা ফি মানাকিবি আবী হানীফা। ১৩১৭ হিজরীতে হায়দরাবাদে প্রকাশিত হয়।

২১. শামসুদ্দীন আবূ আবদুল্লাহ্ মুহাম্মদ ইব্‌ন ইউসুফ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন ইউসুফ আদ দিমাশ্‌কী (৯৪২/১৫৩৫) : আয়াসোফিয়া, ইস্তাম্বুল, কায়রো।

২২. আহমদ ইব্‌ন মুহাম্মদ ইব্‌ন আলী ইব্‌ন হাজর আল-হাইছামী (মৃ.৯৭৩/১৫৬৫) : আল খায়রাত আল হিসান ফি মানাকিবিল ইমাম আল-আ'যম। কায়রোতে হিজরী ১৩০৪, ১৩১১ ও ১৩২৬ সনে প্রকাশিত।

২৩. আবুল কাসিম আবদুল আলীম ইব্‌ন আবিল কাসিম ইব্‌ন উসমান আল হানাফী (৯৭৪/১৫৬৬) : কালায়েদ উকূদ আদদুরার ওয়া আল ইকইয়ান ফি মানাকিব আল ইমাম আবী হানীফা আল নু'মান। দামিশক, ইস্তাম্বুল, কায়রো মৌসেল।

২৪. আবদুল গফুর ইব্‌ন হুসাইন ইব্‌ন আলী আল আলমায়ী : মানাকিব আল ইমাম আবী হানিফা। ইস্তাম্বুল।

২৫. আবুল লাইস মুহাররম ইব্‌ন মুহাম্মদ আল যায়লায়ী (মৃ. ১০০৭/১৫৯৯) : মানাকিব আবী হানীফা ওয়া সাহিবাইহি আবী ইউসুফ ওয়া মুহাম্মদ ইব্‌ন আল হাসান। লেখকের নিজ হস্ত লিখিত কপি ইস্তাম্বুলের তাইমুরিয়া কুতুবখানায় সংরক্ষিত। ১০১৬/১৬০৭ সনে কায়রোতে প্রকাশিত।

২৬. নূহ ইব্‌ন মুস্তাফা আল রুমী (মৃ. ১০৭০/১৬৫৯) : আল দুররুল মুনায্‌যাম ফি মানাকিব আল ইমাম আল আ'যম। ইস্তাম্বুল, আল-আযহার। কায়রো।

২৭. আহমদ ইব্‌ন আবদিল মুন'য়িম ইব্‌ন খাইয়্যাম আল-দামহুরী (মৃ.১১৯২/১৭৭৮): ইত্‌হাফ আল মুহতাদীন বে মানাকিব আয়িম্যাতিদ দীন। কায়রো, ইস্তাম্বুল।

২৮. আর রায়হান লি মানাকিব আন নু'মান; রচয়িতা অজ্ঞাত। ইস্তাম্বুল, কায়রো।

২৯. মানাকিব আবী হানীফা : লেখক অজ্ঞাত। কায়রো।

৩০. মানাকিব আল আয়িম্মা আল আরবাআ : লেখক অজ্ঞাত। কায়রো। ১২৮০ হিজরীতে তিউনিসে প্রকাশিত।

৩১. আবদুল আউয়াল জৌনপুরী : আল নাওয়াদির আল মু'নীফা বি মানাকিব আল ইমাম আবী হানীফা ১৩১০ হিজরীতে কানপুরে মুদ্রিত।

৩২. সাইয়্যেদ আফীফী : হায়াত আল ইমাম আবী হানীফা। ১৩৫০ হিজরীতে কায়রোতে প্রকাশিত।

৩৩. মুহাম্মদ আবূ যুহরা : আবূ হানীফা। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে কায়রোতে মুদ্রিত।

৩৪. মুহাম্মদ ইউসুফ মূসা : আবূ হানীফা ওয়াল কায়্যেম আল ইনসানিয়্যা। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে কায়রোতে প্রকাশিত।

ইমাম আবূ হানীফা (র) সম্পর্কিত তথ্যসূত্র

১. আল আশ'আরী : আল মাকালাত, ১/১৩৮-১৩৯

২. ইব্ন নদীম : আল ফিহরিস্ত, ২০১

৩. ইব্ন আবদিল বার : আল ইনতিকা, ১২১-১৭৫

৪. ইবনুল আছীর : আল লুবাব, ১/৩২৫

৫. ইব্ন কাছীর : আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ১০/১০৭

৬. ইব্ন খাল্লিকান : আল অফাইয়াত (বুলাক), ২/২১৫-২১৯

৭. ইব্ন তুগরী বুর্দী : আন নুজুম আয্ যাহিরা, ২/১২-১৫

৮. আল ফারাশী : আল জাওয়াহির, ১/২৬-৩২

৯. আল খাতীব : তারীখ বাগদাদ, ১৩/৩২৩-৪৫৪

১০. আল ইয়াফিঈ : মারায়াতুল জিনান, ১/৩০৯-৩১২

১১. আয্ যাহাবী : তাযকিরাতুল হুফ্ফায, ১৬৮-১৬৯

১২. আশ শীরাযী : তাবাকাত আল ফুকাহা, ৬৭-৬৮

১৩. ড. এ. কে. এম. আইয়ুব আলী : আকীদাতুল ইসলাম, ৮৬-২৫৯

১৪. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ : Codification of Muslim Law : 1950-1955, pp.369-378.

১৫. C. C. Adams, A. H. : Champion of liberation and tolerance in Islam, MU 36/1946/217-227.

১৬. Th. W. Junymboll ; Encyclopedia of Islam, I, 96-97.

১৭. J. Schacht : The Origins of Muhammadan Jurisprudence, oxford, 1950.

১৮. Wensenck : The Muslim Creed, Cambridge, 1932.

১৯. Brockelmann : GAL, i, p. 176; suppl. i. p. 284.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

مَتْنُ الْفِقْهِ الْاَكْبَرِ لِلْاِمَامِ الْأَعْظَمِ رَضِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَنْهُ

١. أَصْلُ التَّوْحِيْدِ وَمَا يَصِحُّ الْاِعْتِقَادُ عَلَيْهِ يَجِبُ اَنْ يَقُوْلَ :

১. তাওহীদের মূল এবং যার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করা বাঞ্ছনীয় তাহলো অনিবার্যভাবে একথা বলা ঃ

٢. آمَنْتُ بِاللّٰهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ

২. আমি ঈমান এনেছি আল্লাহ্‌তে, তাঁর ফিরিশতায়, তাঁর কিতাবে, তাঁর রাসূলে,

وَالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى

মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ায়, অদৃষ্টে যার ভালমন্দ সবই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে;

وَالْحِسَابِ وَالْمِيْزَانِ وَالْجَنَّةِ وَالنَّارُ حَقٌّ كُلُّهُ .

এবং হিসাব, মীযান, বিহিশত, দোযখ সবই সত্য।

٣. وَاللّٰهُ تَعَالٰى وَاحِدٌ، لَا مِنْ طَرِيْقِ الْعَدَدِ وَلٰكِنْ مِنْ طَرِيْقِ اَنَّهُ

৩. আল্লাহ্ তা'আলা এক, ইহা সংখ্যার দিক দিয়ে নয়, বরং এদিক দিয়ে

لَا شَرِيْكَ لَهُ، قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ، اَللّٰهُ الصَّمَدُ ، لَمْ يَلِدْ

যে, তাঁর কোন শরীক নেই। আপনি বলুন : তিনিই আল্লাহ্--এক অদ্বিতীয় ; আল্লাহ্ কারো মুখাপেক্ষী নন, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী ; তিনি কাউকে জন্ম দেন নি,

وَلَمْ يُوْلَدْ ، وَلَمْ يَكُنْ لَّهُ كُفُوًا اَحَدٌ . (سورة الاخلاص : ١١٢/١-٤)

এবং তাঁকেও জন্ম দেওয়া হয় নি ; আর তাঁর সমতুল্য কেউ নেই।

لَا يُشْبِهُ شَيْئًا مِنَ الْأَشْيَاءِ مِنْ خَلْقِهِ ، وَلَا يُشْبِهُهُ شَيْءٌ مِّنْ خَلْقِهِ

তিনি তাঁর সৃষ্টির কোন বস্তুর মত নন এবং তাঁর সৃষ্টির কোন বস্তুও তাঁর মত নয়।

لَمْ يَزَلْ وَلاَ يَزَالُ بِأَسْمَائِهِ وَ صِفَاتِهِ الذَّاتِيَّةِ وَالْفِعْلِيَّةِ ۔

তিনি অনাদি, তিনি অনন্ত স্বীয় সত্তাগত ও ক্রিয়াগত নাম ও গুণাবলীসহ।

أَمَّا الذَّاتِيَّةُ فَالْحَيَاةُ وَالْقُدْرَةُ وَالْعِلْمُ وَالْكَلاَمُ وَالسَّمْعُ

তাঁর সত্তাগত গুণ : জীবন, শক্তি, জ্ঞান, কথা, শ্রবণ,

وَالْبَصَرُ وَالْإِرَادَةُ ، وَأَمَّا الْفِعْلِيَّةُ فَالتَّخْلِيْقُ

দর্শন, ইচ্ছা। আর তাঁর ক্রিয়াগত গুণ : সৃষ্টি করা,

وَالتَّرْزِيْقُ وَالْإِنْشَاءُ وَالْإِبْدَاعُ وَالصُّنْعُ وَغَيْرُ ذٰلِكَ مِنْ صِفَاتِ الْفِعْلِ

আহার্য দান করা, আরম্ভ করা, উদ্ভাবন করা, তৈরি করা, এরূপ অন্যান্য ক্রিয়াগত গুণ।

٤. لَمْ يَزَلْ وَلاَ يَزَالُ بِأَسْمَائِهِ وَصِفَاتِهِ ، لَمْ يَحْدُثْ لَهُ اسْمٌ وَلاَ صِفَةٌ

৪. তিনি অনাদি, তিনি অনন্ত স্বীয় নাম ও গুণ সহ। কোন নতুনত্ব নেই তাঁর নামে আর গুণে।

لَمْ يَزَلْ عَالِمًا بِعِلْمِهِ ، وَالْعِلْمُ صِفَةٌ فِى الْأَزَلِ ؛ وَقَادِرًا بِقُدْرَتِهِ ،

তিনি স্বীয় জ্ঞানে সর্বদা জ্ঞানী, আর জ্ঞান তাঁর স্থায়ীগুণ ; এবং তিনি স্বীয় শক্তিতে শক্তিমান,

وَالْقُدْرَةُ صِفَةٌ فِى الْأَزَلِ ؛ مُتَكَلِّمًا بِكَلاَمِهِ ،

আর শক্তি তাঁর স্থায়ী গুণ ; তিনি স্বীয় বাণীতে বাঙ্‌ময়,

وَالْكَلاَمُ صِفَةٌ فِى الْأَزَلِ ؛ وَخَالِقًا بِتَخْلِيْقِهِ ، وَالتَّخْلِيْقُ صِفَةٌ فِى الْأَزَلِ ؛

আর বাণী তাঁর স্থায়ী গুণ ; তিনি স্রষ্টা স্বীয় সৃষ্টিতে, আর সৃষ্টি তাঁর স্থায়ী গুণ ;

وَفَاعِلاً بِفِعْلِهِ ، وَالْفِعْلُ صِفَةٌ فِى الْأَزَلِ ؛

তিনি কর্তা স্বীয় কর্মে, আর কর্ম তাঁর স্থায়ী গুণ ;

وَالْفَاعِلُ هُوَ اللّٰهُ تَعَالىٰ ، اَلْفِعْلُ صِفَةٌ فِى الْأَزَلِ

আল্লাহ্ তা'আলাই কর্তা এবং তাঁর ক্রিয়া স্থায়ী গুণ,

وَالْمَفْعُوْلُ مَخْلُوْقٌ ، وَفِعْلُ اللّٰهِ تَعَالىٰ غَيْرُ مَخْلُوْقٍ ،

কর্ম হলো সৃষ্ট এবং আল্লাহ্ তা'আলার ক্রিয়া অবিনশ্বর ;

وَصِفَاتُهُ فِى الْأَزَلِ غَيْرُ مُحْدَثَةٍ ، وَلاَ مَخْلُوْقَةٍ

আর তাঁর গুণাবলী চিরন্তন, শাশ্বত ও অবিনশ্বর।

فَمَنْ قَالَ : إِنَّهَا مَخْلُوقَةٌ أَوْ مُحْدَثَةٌ أَوْ وَقَفَ أَوْ شَكَّ فِيهَا ،

সুতরাং যে বলে : এসব সৃষ্ট অথবা নশ্বর, অথবা সিদ্ধান্ত প্রকাশে চুপ থাকে, অথবা তাতে সন্দেহ পোষণ করে,

فَهُوَ كَافِرٌ بِاللهِ تَعَالَىٰ .

সে তো অস্বীকার করে আল্লাহ্ তা'আলাকেই।

৫. وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ تَعَالَىٰ فِي الْمَصَاحِفِ مَكْتُوبٌ

৫. আল কুরআন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী যা গ্রন্থে লিপিবদ্ধ,

وَفِي الْقُلُوبِ مَحْفُوظٌ وَعَلَى الْأَلْسُنِ مَقْرُوءٌ وَعَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ

অন্তরে সুরক্ষিত, রসনায় পঠিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি

الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مُنَزَّلٌ ، وَلَفْظُنَا بِالْقُرْآنِ مَخْلُوقٌ ،

ওয়া সাল্লামের ওপর অবতীর্ণ। আল কুরআনে আমাদের উচ্চারণ সৃষ্ট,

وَكِتَابَتُنَا لَهُ مَخْلُوقَةٌ وَقِرَاءَتُنَا لَهُ مَخْلُوقَةٌ ، وَالْقُرْآنُ غَيْرُ مَخْلُوقٍ

তাতে আমাদের লিখন সৃষ্ট, তাতে আমাদের পঠন সৃষ্ট, কিন্তু আল কুরআন সৃষ্ট নয়-শাশ্বত।

وَمَا ذَكَرَ اللهُ تَعَالَىٰ فِي الْقُرْآنِ حِكَايَةً عَنْ مُوسَىٰ وَغَيْرِهِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ

যা কিছু আল্লাহ্ তা'আলা আল কুরআনে ঘটনা হিসাবে বর্ণনা করেছেন মুসা ও অন্যান্য আম্বিয়া

عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وَعَنْ فِرْعَوْنَ وَإِبْلِيسَ

فَإِنَّ ذَٰلِكَ كُلَّهُ كَلَامُ اللهِ تَعَالَىٰ

আলাইহিস সালাত ওয়াস সালাম এবং ফিরআউন ও ইবলীস সম্পর্কে, তা সবই আল্লাহ্ তা'আলার বাণী

إِخْبَارًا عَنْهُمْ ، وَكَلَامُ اللهِ تَعَالَىٰ غَيْرُ مَخْلُوقٍ

وَكَلَامُ مُوسَىٰ وَغَيْرِهِ مِنَ الْمَخْلُوقِينَ

তাদের সংবাদ সম্বলিত। আল্লাহ্ তা'আলার বাণী সৃষ্ট নয়--শাশ্বত। মূসা ও অন্যান্য সৃষ্ট জীবের

مَخْلُوقٌ ؛ وَالْقُرْآنُ كَلَامُ اللهِ تَعَالَىٰ فَهُوَ قَدِيمٌ لَا كَلَامُهُمْ .

কথা সৃষ্ট-নশ্বর। আল কুরআন আল্লাহ্ তা'আলার বাণী--যা চিরন্তন, কিন্তু তাদের কথা চিরন্তন নয়।

٦. وَسَمِعَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ كَلَامَ اللّٰهِ تَعَالَىٰ
كَمَا قَالَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ ؛ وَكَلَّمَ اللّٰهُ

৬. মূসা (আ) আল্লাহ্ তা'আলার বাণী শ্রবণ করেছিলেন, যেমন আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন : আর কথা বলেছিলেন আল্লাহ্

مُوسَىٰ تَكْلِيمًا (النساء ٤/١٦٤) وَقَدْ كَانَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ مُتَكَلِّمًا
وَلَمْ يَكُنْ كَلَّمَ مُوسَىٰ عَلَيْهِ السَّلَامُ

মূসার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে (নিসা : ৪/১৬৪) আল্লাহ্ তা'আলা হলেন শাশ্বত বক্তা। কিন্তু মূসা (আ) সেরূপ নন।

وَقَدْ كَانَ اللّٰهُ تَعَالَىٰ خَالِقًا فِي الْأَزَلِ وَلَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ .

আল্লাহ্ তা'আলা হলেন শাশ্বত স্রষ্টা এবং কোন কিছু তাঁর মত নয় আর তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা।

فَلَمَّا كَلَّمَ اللّٰهُ مُوسَىٰ كَلَّمَهُ بِكَلَامِهِ الَّذِيْ هُوَ لَهُ صِفَةٌ فِي الْأَزَلِ
وَصِفَاتُهُ كُلُّهَا

যখন আল্লাহ্ মূসার সঙ্গে কথা বলেছেন তখন স্বীয় বাণী দিয়েই বলেছেন যা তাঁর শাশ্বত গুণ, আর তাঁর যাবতীয় গুণ

بِخِلَافِ صِفَاتِ الْمَخْلُوقِيْنَ يَعْلَمُ لَا كَعِلْمِنَا وَيَقْدِرُ لَا كَقُدْرَتِنَا

সৃষ্ট জীবের গুণ থেকে আলাদা। তিনি জানেন তবে আমাদের জানার মত নয়। তিনি শক্তি রাখেন তবে আমাদের শক্তির মত নয়।

وَيَرَىٰ لَا كَرُؤْيَتِنَا وَيَسْمَعُ لَا كَسَمْعِنَا وَيَتَكَلَّمُ لَا كَكَلَامِنَا

তিনি দেখেন তবে আমাদের দেখার মত নয়। তিনি শুনেন তবে আমাদের শুনার মত নয়। তিনি কথা বলেন তবে আমাদের কথা বলার মত নয়।

وَنَحْنُ نَتَكَلَّمُ بِالْآلَاتِ وَالْحُرُوفِ . وَاللّٰهُ تَعَالَىٰ يَتَكَلَّمُ
بِلَا آلَةٍ وَلَا حُرُوفٍ .

কেননা আমরা তো কথা বলি উপকরণ ও বর্ণের সাহায্যে আর আল্লাহ্ তা'আলা কথা বলেন উপকরণ ও বর্ণ ছাড়া।

وَالْحُرُوفُ مَخْلُوقَةٌ ، وَكَلَامُ اللّٰهِ تَعَالَىٰ غَيْرُ مَخْلُوقٍ .

বর্ণসমূহ সৃষ্ট আর আল্লাহ্ তা'আলার কথা সৃষ্ট নয়।

৩—

٧. وَهُوَ شَيْءٌ لَا كَالْأَشْيَاءِ · وَمَعْنَى الشَّيْءِ إِثْبَاتُهُ بِلَاجِسْمٍ وَلَا جَوْهَرٍ

৭. তিনি বস্তু তবে অন্যান্য সৃষ্ট বস্তুর মত নন। আর তাঁর বস্তু হওয়ার অর্থ তাঁর সত্তার নিত্যতার স্বীকৃতি দেয়া যে, তিনি দেহহীন, তিনি মৌল বস্তুও নন

وَلَا عَرْضٍ وَلَا حَدَّ لَهُ وَلَا ضِدَّ لَهُ وَلَا نِدَّ لَهُ وَلَا مِثْلَ لَهُ .

এবং পরাশ্রয়ী বস্তুও নন, তাঁর কোন সীমা নেই, তাঁর কোন প্রতিপক্ষ নেই, তাঁর কোন অংশীদার নেই এবং কোন সাদৃশ্যও নেই।

وَلَهُ يَدٌ وَ وَجْهٌ وَنَفْسٌ ، كَمَا ذَكَرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِى الْقُرْآنِ

তাঁর হাত আছে, চেহারা আছে এবং প্রাণ আছে, যেরূপ আল কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা তা বর্ণনা করেছেন।

فَمَا ذَكَرَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِى الْقُرْآنِ مِنْ ذِكْرِ الْوَجْهِ وَالْيَدِ وَالنَّفْسِ

তবে আল্লাহ্ তা'আলা আল কুরআনে চেহারা, হাত ও প্রাণ সম্পর্কে যা উল্লেখ করেছেন

فَهُوَ لَهُ صِفَاتٌ بِلَا كَيْفٍ . وَلَا يُقَالُ : اِنَّ يَدَهُ قُدْرَتُهُ أَوْ نِعْمَتُهُ ،

তা অবশ্যই তাঁরই গুণাবলী যার ধরন জানা নেই। একথা কদাচ বলা যাবে না যে, তাঁর হাত মানে তাঁর শক্তি অথবা তাঁর দান।

لِاَنَّ فِيْهِ اِبْطَالَ الصِّفَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَهْلِ الْقَدْرِ وَالْاِعْتِزَالِ

কেননা এতে রয়েছে গুণের অস্বীকৃতি। আর ইহা কাদারিয়া ও মু'তাযিলাদের মতবাদ।

وَلٰكِنَّ يَدَهُ صِفَتُهُ بِلَا كَيْفٍ ، وَغَضَبُهُ وَرِضَاهُ صِفَتَانِ مِنْ صِفَاتِهِ تَعَالٰى بِلَا كَيْفٍ ،

বস্তুত: তাঁর হাত তাঁরই গুণ যার ধরন ও প্রকৃতি জানা নেই। অনুরূপভাবে তাঁর ক্রোধ এবং তাঁর সন্তুষ্টি তাঁর গুণাবলীর দুটি, গুণ যার ধরন ও প্রকৃতি জানা নেই।

٨. خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالٰى الْأَشْيَاءَ لَا مِنْ شَيْءٍ ،

৮. আল্লাহ্ তা'আলা যাবতীয় বস্তু সৃষ্টি করেছেন তবে তা কোন বস্তু থেকে নয়।

وَكَانَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَالِمًا فِى الْأَزَلِ بِالْأَشْيَاءِ قَبْلَ كَوْنِهَا ،

সব বস্তুর অস্তিত্বের পূর্বেই আল্লাহ্ তা'আলা সে সম্পর্কে আদিতেই অবহিত ছিলেন।

٩. وَهُوَ الَّذِىْ قَدَّرَ الْأَشْيَاءَ وَقَضَاهَا

৯. তিনিই নির্ধারণ করেছেন যাবতীয় বস্তু এবং নির্দেশ করেছেন তা।

وَلَا يَكُوْنُ فِى الدُّنْيَا وَ لَا فِى الْآخِرَةِ شَيْءٌ

দুনিয়া ও আখিরাতে কোন কিছুই সংঘটিত হয় না

اِلَّا بِمَشِيْئَتِهٖ وَعِلْمِهٖ وَقَضَائِهٖ وَقَدْرِهٖ وَكِتَبِهٖ فِى اللَّوْحِ الْمَحْفُوْظِ

তাঁর ইচ্ছা, তাঁর জ্ঞান, তাঁর সিদ্ধান্ত, তাঁর নির্ধারণ এবং লওহে মাহফূযে তাঁর লিখন ছাড়া।

وَلٰكِنْ كَتَبَهٗ بِالْوَصْفِ لَا بِالْحُكْمِ . وَالْقَضَاءُ وَالْقَدْرُ وَالْمَشِيْئَةُ

তবে তাঁর এ লিখন সংঘটনের বর্ণনারূপে, নির্দেশরূপে নয়। সিদ্ধান্ত, নির্ধারণ ও ইচ্ছা

صِفَاتُهٗ فِى الْاَزَلِ بِلَا كَيْفٍ ، يَعْلَمُ اللّٰهُ تَعَالَى الْمَعْدُوْمَ فِىْ حَالِ عَدَمِهٖ

তাঁর শাশ্বত গুণ, যার প্রকৃতি ও ধরন জানা নেই। আল্লাহ্ তা'আলা অনস্তিত্বময় বস্তুকে অস্তিত্বে না থাকা অবস্থায়ই

مَعْدُوْمًا ؛ وَيَعْلَمُ اَنَّهٗ كَيْفَ يَكُوْنُ اِذَا اَوْجَدَهٗ -

অনস্তিত্বময় বস্তু হিসাবে জানেন। এবং তা অস্তিত্বে আনয়ন করলে কিরূপ হতো তাও তিনি জানেন।

وَيَعْلَمُ اللّٰهُ تَعَالَى الْمَوْجُوْدَ فِىْ حَالِ وُجُوْدِهٖ مَوْجُوْدًا ؛ وَيَعْلَمُ اَنَّهٗ كَيْفَ يَكُوْنُ فَنَاؤُهٗ -

আল্লাহ তা'আলা অস্তিত্বে থাকা অবস্থায়ই অস্তিত্বশীল বস্তু হিসাবে জানেন। এবং তার বিলুপ্তি কিরূপে হবে তাও তিনি জানেন।

وَيَعْلَمُ اللّٰهُ تَعَالَى الْقَائِمَ فِىْ حَالِ قِيَامِهٖ قَائِمًا ، وَاِذَا قَعَدَ عَلِمَهٗ قَاعِدًا

যেমন তিনি কোন দণ্ডায়মান ব্যক্তিকে তার দাঁড়ানো অবস্থায় দণ্ডায়মান হিসাবে জানেন এবং যখন সে উপবেশন করে তখন তাকে উপবিষ্ট হিসাবে জানেন

فِىْ حَالِ قُعُوْدِهٖ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَتَغَيَّرَ عِلْمُهٗ اَوْ يَحْدُثَ لَهٗ عِلْمٌ ،

তার উপবেশনের অবস্থায় ; এতে তাঁর জ্ঞানে কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না, আর না কোন নতুন জ্ঞানের প্রয়োজন হয়।

وَلٰكِنَّ التَّغَيُّرَ وَالْاِخْتِلَافَ يَحْدُثُ فِى الْمَخْلُوْقِيْنَ -

কেননা পরিবর্তন ও বিবর্তন সংঘটিত হয় সৃষ্টির মাঝে।

١٠. خَلَقَ اللّٰهُ تَعَالىٰ الْخَلْقَ سَلِيْمًا مِنَ الْكُفْرِ وَالْاِيْمَانِ

১০. আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকে ঈমান ও কুফর থেকে মুক্ত অবস্থায় সৃষ্টি করেছেন।

ثُمَّ خَاطَبَهُمْ وَأَمَرَهُمْ وَنَهَاهُمْ ، فَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ بِفِعْلِهٖ ،

তারপর তিনি তাদের সম্বোধন করেছেন, আদেশ দিয়েছেন তাদের ও নিষেধ করেছেন তাদের। অতঃপর তাদের কেউ কেউ কুফরী করেছে স্বীয় কর্মের দ্বারা,

وَاِنْكَارَهٗ وَجُحُوْدَهٗ بِخُذْلَانِ اللّٰهِ تَعَالىٰ اِيَّاهُ ؛ وَآمَنَ مَنْ آمَنَ بِفِعْلِهٖ ،

অস্বীকার ও অবাধ্যতার মাধ্যমে ছেড়ে দিয়ে আল্লাহ্‌কে। এবং তাদের কেউ কেউ ঈমান এনেছে স্বীয় কর্মের দ্বারা,

وَاِقْرَارَهٗ وَتَصْدِيْقَهٗ بِتَوْفِيْقِ اللّٰهِ تَعَالىٰ اِيَّاهُ وَنُصْرَتِهٖ لَهٗ

স্বীকৃতির দ্বারা, এবং অন্তরের প্রত্যয় দ্বারা, আল্লাহ্‌ তা'আলার তাওফীকে ও তার প্রতি আল্লাহ্‌র মদদে।

أَخْرَجَ ذُرِّيَّةَ آدَمَ مِنْ صُلْبِهٖ عَلىٰ صُوَرِ الذَّرِّ ، فَجَعَلَهُمْ عُقَلَاءَ ،
(فَجَعَلَ لَهُمْ عَقْلًا)

আদম (আ)-এর পৃষ্ঠ থেকে তাঁর সন্তানদের বের করেছেন, অতি ক্ষুদ্র পিঁপড়ার মত। তাদের দিয়েছেন জ্ঞান,

فَخَاطَبَهُمْ وَأَمَرَهُمْ بِالْاِيْمَانِ وَنَهَاهُمْ عَنِ الْكُفْرِ ، فَاَقَرُّوْا لَهٗ بِالرُّبُوْبِيَّةِ

অতঃপর তাদের সম্বোধন করেছেন এবং নির্দেশ দিয়েছেন ঈমান আনতে আর বারণ করেছেন কুফরী করতে, তখন তারা স্বীকৃতি দিয়েছিল তাঁর রাবুবিয়্যাতের।

فَكَانَ ذٰلِكَ مِنْهُمْ اِيْمَانًا ، فَهُمْ يُوْلَدُوْنَ عَلىٰ تِلْكَ الْفِطْرَةِ

আর ইহাই হলো তাদের প্রকৃত ঈমান এবং এই প্রকৃতির ওপরই তারা ভূমিষ্ঠ হয়।

وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَقَدْ بَدَّلَ وَغَيَّرَ ؛ وَمَنْ آمَنَ وَصَدَّقَ فَقَدْ ثَبَتَ

কিন্তু যে পরে কুফরী করল সে তো বদলে দিলো ও পরিবর্তন করে দিল (তার ঈমান কুফরী দিয়ে)। আর যে ঈমান আনলো এবং সত্য প্রমাণ করলো (তার ঈমানের অঙ্গীকার)

١١. عَلَيْهِ وَدَاوَمَ وَلَمْ يُجْبِرْ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهٖ عَلىٰ الْكُفْرِ وَلَا عَلىٰ الْاِيْمَانِ

১১. আল্লাহ্‌ তা'আলা তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কাউকে বাধ্য করেন না কুফরী করতে আর না ঈমান আনতে, সে তো স্থির ও স্থায়ী রইলো (তার দীনে)।

وَلَا خَلَقَهُمْ مُؤْمِنًا وَلَا كَافِرًا ، وَلٰكِنْ خَلَقَهُمْ أَشْخَاصًا ،

এবং তাদের কাউকে তিনি সৃষ্টি করেননি মু'মিন হিসাবে আর না কাফির হিসাবে। বরং তাদের সৃষ্টি করেছেন ব্যক্তি হিসাবে।

وَالْإِيْمَانُ وَالْكُفْرُ فِعْلُ الْعِبَادِ . وَيَعْلَمُ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ يَكْفُرُ فِيْ حَالِ كُفْرِهِ كَافِرًا ،

ঈমান এবং কুফর বান্দার কর্ম। যে কুফরী করে তাকে আল্লাহ্ তা'আলা কুফরী করা অবস্থায় কাফির হিসাবে জানেন।

فَإِذَا آمَنَ بَعْدَ ذٰلِكَ عَلِمَهُ مُؤْمِنًا فِيْ حَالِ إِيْمَانِهِ ،

পরে যখন সে ঈমান আনে তখন ঈমান আনা অবস্থায় তাকে মু'মিন হিসাবে জানেন,

مِنْ غَيْرِ أَنْ يَتَغَيَّرَ عِلْمُهُ وَصِفَتُهُ .

এতে তাঁর জ্ঞান ও তাঁর গুণের কোন পরিবর্তন হয় না।

١٢. وَجَمِيْعُ أَفْعَالِ الْعِبَادِ مِنَ الْحَرَكَةِ وَالسُّكُوْنِ كَسْبُهُمْ عَلَى الْحَقِيْقَةِ ، وَاللّٰهُ تَعَالٰى خَالِقُهَا ،

১২. প্রকৃতপক্ষে বান্দার কার্যাবলী যেমন গতি ও স্থিতি সবই তাদের উপার্জন, এবং আল্লাহ তা'আলা সে সবের স্রষ্টা,

وَهِيَ كُلُّهَا بِمَشِيْئَتِهِ وَعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَقَدْرِهِ .

এবং সে সবই সংঘটিত হয় তাঁর ইচ্ছায়, তাঁর জ্ঞানে, তাঁর ফয়সালায় এবং তার নির্ধারণে।

وَالطَّاعَاتُ كُلُّهَا كَانَتْ وَاجِبَةً بِأَمْرِ اللّٰهِ تَعَالٰى وَبِمَحَبَّتِهِ وَبِرِضَائِهِ وَعِلْمِهِ وَمَشِيْئَتِهِ وَقَضَائِهِ وَتَقْدِيْرِهِ .

যাবতীয় ইবাদত আল্লাহ্ তা'আলার নির্দেশে, তাঁর ভালবাসায়, তাঁর সন্তুষ্টিতে, তাঁর জ্ঞানে তাঁর ইচ্ছায়, তাঁর ফয়সালায় ও তাঁর নির্ধারণ অনুযায়ী হয়।

وَالْمَعَاصِيْ كُلُّهَا بِعِلْمِهِ وَقَضَائِهِ وَتَقْدِيْرِهِ

আর যাবতীয় পাপ সংঘটিত হয় তাঁর জ্ঞানে, তাঁর ফয়সালায়,

وَمَشِيْئَتِهِ لَا بِمَحَبَّتِهِ وَلَا بِرِضَائِهِ وَلَا بِأَمْرِهِ .

তাঁর নির্ধারণ অনুসারে কিন্তু তাঁর ভালবাসায় নয়, তাঁর সন্তুষ্টিতে নয় এবং তাঁর নির্দেশেও নয়।

١٣. وَالأَنْبِيَاءُ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ كُلُّهُمْ مُنَزَّهُوْنَ عَنِ الصَّغَائِرِ وَالْكَبَائِرِ وَالْكُفْرِ وَالْقَبَائِحِ ،

১৩. সব নবীরা (আ) ছোট বড় পাপ থেকে পবিত্র, যেমন তাঁরা পবিত্র কুফর ও গর্হিত কাজ থেকে।

وَقَدْ كَانَتْ مِنْهُمْ زَلاَّتٌ وَخَطَايَا

কিন্তু তাদের থেকে সংঘটিত হয়েছে ছোটখাট ত্রুটি-বিচ্যুতি ও ভুলভ্রান্তি।

١٤. وَمُحَمَّدٌ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ حَبِيْبُهُ وَعَبْدُهُ وَنَبِيُّهُ وَرَسُوْلُهُ وَصَفِيُّهُ وَنَقِيُّهُ ۔

১৪. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন আল্লাহ্‌র বন্ধু, তাঁর বান্দা, তাঁর রাসূল, তাঁর নবী, তাঁর মনোনীত, তাঁর নির্বাচিত।

وَلَمْ يَعْبُدِ الصَّنَمَ وَلَمْ يُشْرِكْ بِاللهِ تَعَالَىٰ طَرْفَةَ عَيْنٍ قَطُّ ، وَلَمْ يَرْتَكِبْ صَغِيْرَةً وَلاَ كَبِيْرَةً قَطُّ۔

এবং তিনি কখনো মূর্তিপূজা করেননি আর না তিনি এক পলকের জন্যও আল্লাহ্ তা'আলার সঙ্গে শরীক করেছেন। ছোট বা বড় কোন পাপ তিনি কখনো করেননি।

١٥. وَأَفْضَلُ النَّاسِ بَعْدَ النَّبِيِّيْنَ عَلَيْهِمُ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَبُوْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقُ

১৫. নবীদের (আ) পরে সর্বশ্রেষ্ঠ মানুষ হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা),

ثُمَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ الْفَارُوْقُ ثُمَّ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ذُو النُّوْرَيْنِ

তাঁরপর হযরত উমর ইবন আল-খাত্তাব আল ফারূক (রা), তাঁরপর হযরত উসমান ইবন আফ্‌ফান যুন্নূরাইন (রা),

ثُمَّ عَلِيُّ بْنُ أَبِىْ طَالِبِ الْمُرْتَضَى رِضْوَانُ اللهِ تَعَالَىٰ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِيْنَ عَابِدِيْنَ ثَابِتِيْنَ عَلَى الْحَقِّ وَمَعَ الْحَقِّ كَانُوْا ؛

তাঁরপর হযরত আলী ইবন আবূ তালিব আল মুরতাজা (রা)। এরা সবাই ছিলেন ইবাদতকারী, সত্যের উপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত এবং সর্বদা অবিচল।

نَتَوَلاَّهُمْ جَمِيْعًا ، وَلاَ نَذْكُرُ أَحَدًا مِّنْ أَصْحَابِ رَسُوْلِ اللهِ إِلاَّ بِخَيْرٍ

এদের সবাইকে আমরা ভালবাসি। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সাহাবীদের কাউকে আমরা উত্তম ছাড়া স্মরণ করি না।

١٦. وَلَا نُكَفِّرُ مُسْلِمًا بِذَنْبٍ مِّنَ الذُّنُوْبِ وَاِنْ كَانَتْ كَبِيْرَةً

১৬. কোন পাপের কারণে আমরা কোন মুসলিমকে কাফির বলবো না যদিও সে পাপ বড় পাপ হয় (কবীরা গুনাহ),

اِذَا لَمْ يَسْتَحِلَّهَا ، وَلَا نُزِيْلُ عَنْهُ اِسْمَ الْاِيْمَانِ ، وَنُسَمِّيْهِ مُؤْمِنًا حَقِيْقَةً

যতক্ষণ না সে তা হালাল মনে করে ; এবং তাঁর ঈমান নেই একথাও বলবো না ; বরং তাকে প্রকৃত মু'মিন হিসাবেই নাম দিব।

وَيَجُوْزُ أَنْ يَكُوْنَ مُؤْمِنًا فَاسِقًا غَيْرَ كَافِرٍ .

এবং কোন মু'মিন ব্যক্তি ফাসিক হতে পারে কিন্তু কাফির নয়।

١٧. وَالْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ سُنَّةٌ ، وَالتَّرَاوِيْحُ فِيْ لَيَالِيْ شَهْرِ رَمَضَانَ سُنَّةٌ

১৭. মোজার ওপর মস্‌হে করা সুন্নতে রাসূল দ্বারা প্রমাণিত। রমযান মাসের রাতে তারাবীহ নামাযও অনুরূপ সুন্নত।

١٨. وَالصَّلَاةُ خَلْفَ كُلِّ بَرٍّ وَفَاجِرٍ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ جَائِزَةٌ .

১৮. প্রত্যেক নেককার ও বদকার মু'মিনের পেছনে নামায আদায় করা বৈধ।

وَلَا نَقُوْلُ : اِنَّ الْمُؤْمِنَ لَا تَضُرُّهُ الذُّنُوْبُ ، وَلَا نَقُوْلُ : اَنَّهُ لَا يَدْخُلُ النَّارَ ، وَلَا نَقُوْلُ : اَنَّهُ يَخْلُدُ فِيْهَا

আমরা একথা বলি না যে, মু'মিন ব্যক্তিকে তার পাপ ক্ষতি করে না ; এবং একথাও বলিনা যে, সে দোযখে প্রবেশ করবে না ; আর একথাও বলিনা যে, সে চিরকাল তথায় থাকবে,

وَاِنْ كَانَ فَاسِقًا بَعْدَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدُّنْيَا مُؤْمِنًا ، وَلَا نَقُوْلُ : اِنَّ

যদিও সে হয় একজন ফাসিক আর দুনিয়া থেকে মু'মিন হিসাবে মৃত্যুবরণ করে থাকে। আমরা এ কথাও বলিনা যে,

حَسَنَاتِنَا مَقْبُوْلَةٌ وَسَيِّئَاتِنَا مَغْفُوْرَةٌ كَقَوْلِ الْمُرْجِئَةِ ، وَلٰكِنْ نَقُوْلُ :

আমাদের নেককাজ গুলো গৃহীত এবং আমাদের গুনাহগুলো মার্জনাকৃত, যেমন মুরজিয়ারা বলে থাকে। বরং আমরা বলি :

مَنْ عَمِلَ حَسَنَةً بِجَمِيْعِ شَرَائِطِهَا خَالِيَةً عَنِ الْعُيُوْبِ الْمُفْسِدَةِ

যে কেউ ভাল কাজ করে তার যাবতীয় শর্ত সহকারে, যা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য সব ত্রুটিমুক্ত

وَالْمَعَانِى الْمُبْطِلَةِ وَلَمْ يُبْطِلْهَا بِالْكُفْرِ وَالرِّدَّةِ حَتّٰى خَرَجَ مِنَ الدُّنْيَا مُؤْمِنًا -

এবং যা কুফরী ও ধর্মচ্যুতি বিনষ্ট করেনি এবং সে মু'মিন অবস্থায় দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়।

فَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالىٰ لَا يُضِيْعُهَا بَلْ يَقْبَلُهَا مِنْهُ وَيُثِيْبُهُ عَلَيْهَا .

তাহলে নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'আলা তার নেক কাজগুলো বিনষ্ট করবেন না বরং তা তার থেকে কবুল করবেন এবং সেজন্য তাকে প্রতিদান দিবেন।

١٩. وَمَا كَانَ مِنَ السَّيِّئَاتِ دُوْنَ الشِّرْكِ وَالْكُفْرِ وَلَمْ يَتُبْ عَنْهَا صَاحِبُهَا حَتّٰى مَاتَ مُؤْمِنًا

১৯. শিরক ও কুফর ছাড়া যেসব পাপ রয়েছে তা থেকে যদি কোন মু'মিন ব্যক্তি মৃত্যুর আগে তওবা না করে থাকে

فَاِنَّهُ فِىْ مَشِيْئَةِ اللّٰهِ تَعَالىٰ اِنْ شَاءَ عَذَّبَهُ بِالنَّارِ وَاِنْ شَاءَ عَفَا عَنْهُ

তাহলে তার ব্যাপার আল্লাহ্‌র ইচ্ছার ওপর, তিনি ইচ্ছা করলে তাকে দোযখে শাস্তি দিবেন অথবা মাফ করে দিবেন,

وَلَمْ يُعَذِّبْهُ بِالنَّارِ اَبَدًا .

তবে তাকে চিরকালের জন্য দোযখের শাস্তি দিবেন না।

٢٠. وَالرِّيَاءُ اِذَا وَقَعَ فِىْ عَمَلٍ مِّنَ الْاَعْمَالِ فَاِنَّهُ يُبْطِلُ أَجْرَهُ ، وَكَذٰلِكَ الْعُجُبُ

২০. যখন কোন কাজে রিয়া অনুপ্রবেশ করে তখন তা সে কাজের প্রতিফল বিনষ্ট করে দেয় এবং অহঙ্কারও অনুরূপ।

٢١. وَالْاٰيَاتُ ثَابِتَةٌ لِلْاَنْبِيَاءِ ، وَالْكَرَامَاتُ لِلْاَوْلِيَاءِ حَقٌّ ،

২১. নবীদের মু'জিযা প্রতিষ্ঠিত আর অলীদের কারামত সত্য।

٢٢. وَأَمَّا الَّتِىْ تَكُوْنُ لِاَعْدَائِهِ مِثْلَ اِبْلِيْسَ وَفِرْعَوْنَ وَالدَّجَّالِ مِمَّا رُوِىَ فِى الْاَخْبَارِ اَنَّهُ كَانَ وَيَكُوْنُ لَهُمْ -

২২. কিন্তু যেসব অলৌকিক ঘটনা আল্লাহ্ তা'আলার দুশমন যেমন ইবলীস, ফিরআউন ও দাজ্জালের দ্বারা সংঘটিত হয়েছে, যা হাদীসে বর্ণিত আছে, সেগুলোকে আমরা

لَا نُسَمِّيْهَا آيَاتٍ وَلَا كَرَامَاتٍ وَلٰكِنْ نُسَمِّيْهَا قَضَاءَ حَاجَاتٍ لَهُمْ ،

মু'জিযা বা কারামত বলবো না, বরং সেসব তাদের প্রয়োজন মিটানোর জন্য সংঘটিত হয়েছিল এ কথাই বলবো।

وَذٰلِكَ لِاَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقْضِىْ حَاجَاتِ أَعْدَائِهِ اِسْتِدْرَاجًا لَهُمْ وَعُقُوْبَةً لَهُمْ .

কেননা আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর দুশমনদের প্রয়োজনসমূহ পূরণ করেন দুনিয়ায় তাদের কুমন্ত্রণার অবকাশের জন্য আর আখিরাতের শাস্তির জন্য।

فَيَغْتَرُّوْنَ بِهِ وَيَزْدَادُوْنَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ، ذٰلِكَ كُلُّهُ جَائِزٌ وَمُمْكِنٌ ،

ফলে তারা এতে আরো উদ্ধত হয় এবং কুফরী ও অবাধ্যতায় বেড়ে যায়। এসবই বৈধ ও সম্ভব।

٢٣. وَكَانَ اللّٰهُ تَعَالٰى خَالِقًا قَبْلَ أَنْ يَخْلُقَ وَرَازِقًا قَبْلَ أَنْ يَرْزُقَ

২৩. আল্লাহ্ তা'আলা সৃষ্টি করার পূর্বেই স্রষ্টা এবং রিযকদানের পূর্বেই রিযকদাতা ছিলেন।

٢٤. وَاللّٰهُ تَعَالٰى يُرٰى فِى الْآخِرَةِ ، وَيَرَاهُ الْمُؤْمِنُوْنَ وَهُمْ فِى الْجَنَّةِ بِأَعْيُنِ رُؤُسِهِمْ بِلَا تَشْبِيْهٍ وَلَا كَيْفِيَّةٍ ،

২৪. আখিরাতে আল্লাহ্ তা'আলাকে দেখা যাবে। বিহিশতে মু'মিনরা তাঁকে পরিমাপ-পরিমাণ-তুলনা ছাড়া চাক্ষুষ দেখবেন।

وَلَا يَكُوْنُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ خَلْقِهِ مُسَافَحَةٌ .

তাঁর ও তাঁর সৃষ্টির মধ্যে কোন দূরত্ব থাকবে না।

٢٥. وَالْاِيْمَانُ هُوَ الْاِقْرَارُ وَالتَّصْدِيْقُ . وَاِيْمَانُ أَهْلِ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ لَا يَزِيْدُ وَلَا يَنْقُصُ مِنْ جِهَةِ الْمُؤْمَنِ بِهِ ،

২৫. ঈমান হল প্রকাশ্য স্বীকৃতি ও অন্তরের বিশ্বাস। আসমান ও যমীনের অধিবাসীদের ঈমান মু'মিন হিসাবে বাড়েও না এবং কমেও না।

٢٦. وَيَزِيْدُ وَيَنْقُصُ مِنْ جِهَةِ الْيَقِيْنِ وَالتَّصْدِيْقِ .

২৬. তবে প্রত্যয় ও বিশ্বাস হিসাবে ইহা বাড়ে ও কমে।

٢٧. اَلْمُؤْمِنُوْنَ مُسْتَوُوْنَ فِى الْاِيْمَانِ وَالتَّوْحِيْدِ مُتَفَاضِلُوْنَ فِى الْاَعْمَالِ .

২৭. তওহীদ ও ঈমানের দিক দিয়ে সব মু'মিনরা সমান তবে আমলের নিরিখে মর্যাদায় তারতম্য হয়।

٢٨. وَالْإِسْلَامُ هُوَ التَّسْلِيمُ وَالْإِنْقِيَادُ لِأَوَامِرِ اللّٰهِ تَعَالٰى فَمِنْ طَرِيْقِ اللُّغَةِ فَرْقٌ بَيْنَ الْإِيْمَانِ وَالْإِسْلَامِ ،

২৮. ইসলাম হল আত্মসমর্পণ ও আল্লাহ্ তা'আলার আদেশের আনুগত্য। তবে আভিধানিক দিক থেকে ঈমান ও ইসলামে পার্থক্য রয়েছে।

٢٩. وَلٰكِنْ لَا يَكُوْنُ إِيْمَانٌ بِلَا إِسْلَامٍ وَلَا يُوْجَدُ إِسْلَامٌ بِلَا إِيْمَانٍ ، وَهُمَا كَالظَّهْرِ مَعَ الْبَطْنِ .

বস্তুত: ঈমান কখনো ইসলাম ছাড়া হয় না এবং ইসলামও ঈমান ছাড়া পাওয়া যায় না। এ উভয়ের তুলনা যেন পিঠ ও পেট।

٢٩. وَالدِّيْنُ اِسْمٌ وَاقِعٌ عَلَى الْإِيْمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالشَّرَائِعِ كُلِّهَا .

২৯. আর 'দীন' হল ঈমান, ইসলাম ও যাবতীয় শরীয়তের সমন্বিত নাম।

٣٠. فَعَرَفَ اللّٰهُ تَعَالٰى حَقَّ مَعْرِفَتِهِ كَمَا وَصَفَ اللّٰهُ نَفْسَهُ فِيْ كِتَابِهِ بِجَمِيْعِ صِفَاتِهِ .

৩০. যাবতীয় গুণাবলীসহ আল্লাহ্ তা'আলা যেভাবে নিজেকে স্বীয় কিতাবে বর্ণনা করেছেন আমরা তাঁকে ঠিক সেভাবেই জানি।

وَلَيْسَ يَقْدِرُ أَحَدٌ أَنْ يَعْبُدَ اللّٰهَ تَعَالٰى حَقَّ عِبَادَتِهِ كَمَا هُوَ أَهْلٌ لَهُ ،

আল্লাহ্ তা'আলা যেরূপ ইবাদতের অধিকারী কোন বান্দাই সেরূপ ইবাদত করার শক্তি রাখে না,

وَلٰكِنَّهُ يَعْبُدُهُ بِأَمْرِهِ كَمَا أَمَرَ بِكِتَابِهِ وَسُنَّةِ رَسُوْلِهِ .

তবে যেভাবে ইবাদত করার জন্য আল্লাহ্‌র কিতাবে ও রাসূলের সুন্নাতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে সেভাবেই তাঁর ইবাদত করে।

٣١. وَيَسْتَوِى الْمُؤْمِنُوْنَ كُلُّهُمْ فِى الْمَعْرِفَةِ وَالْيَقِيْنِ وَالتَّوَكُّلِ وَالْمَحَبَّةِ وَالرِّضَاءِ وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَالْإِيْمَانِ وَيَتَفَاوَتُوْنَ فِيْمَا دُوْنَ الْإِيْمَانِ فِيْ ذٰلِكَ كُلِّهِ .

৩১. মু'মিনরা সবাই জানায়, প্রত্যয়ে, ভরসায়, ভালবাসায়, সন্তুষ্টিতে, ভয়ে, আশায় এবং ঈমানে সমান। তবে ঈমান ছাড়া বাকি সবগুলোতে বিভিন্ন হয়ে থাকে।

٣٢. وَاللّٰهُ تَعَالٰى مُتَفَضِّلٌ عَلٰى عِبَادِهِ عَادِلٌ قَدْ يُعْطِيْ مِنَ الثَّوَابِ أَضْعَافَ مَا يَسْتَوْجِبُهُ الْعَبْدُ تَفَضُّلًا مِنْهُ ،

৩২. আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহপরায়ণ ও ন্যায়বিচারক। তাই কখনো তিনি অনুগ্রহ করে তাঁর বান্দাকে তার প্রাপ্যের চেয়ে অধিক ছওয়াব প্রদান করে থাকেন।

وَقَدْ يُعَاقِبُ عَلَى الذَّنْبِ عَدْلاً مِنْهُ ، وَقَدْ يَعْفُوْ فَضْلاً مِنْهُ ۔

আবার কখনো গুনাহের দরুণ ন্যায়বিচারের জন্য তাকে শাস্তি দেন। এবং কখনো দয়া পরবশে তাকে মাফ করে দেন।

٣٣. وَشَفَاعَةُ الْاَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَقٌّ ، وَشَفَاعَةُ نَبِيِّنَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ الْمُذْنِبِيْنَ

৩৩. নবীদের (সা) শাফায়াত সত্য। এবং গুনাহগার মু'মিন বিশেষ করে

وَلِأَهْلِ الْكَبَائِرِ مِنْهُمُ الْمُسْتَوْجِبِيْنَ الْعِقَابَ حَقٌّ ثَابِتٌ

তাদের মাঝে যারা কবীরা গুনাহ করার জন্য শাস্তির হকদার হয়েছে, তাদের জন্য আমাদের নবী (সা)-এর শাফায়াত প্রতিষ্ঠিত সত্য।

٣٤. وَوَزْنُ الْاَعْمَالِ بِالْمِيْزَانِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَقٌّ ۔

৩৪. কিয়ামতের দিন মীযানে আমলের ওজন করা সত্য।

٣٥. وَحَوْضُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَقٌّ

৩৫. নবী (সা)-এর হাওযে কাওসারও সত্য।

٣٦. وَالْقِصَاصُ فِيْمَا بَيْنَ الْخُصُوْمِ بِالْحَسَنَاتِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَقٌّ ۔

৩৬. কিয়ামতের দিন বাদী-বিবাদীদের মধ্যে নেক আমলের বদলা ও ফয়সালা সত্য।

وَاِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُمُ الْحَسَنَاتُ فَطَرْحُ السَّيِّئَاتِ عَلَيْهِمْ حَقٌّ جَائِزٌ ۔

তবে যদি নেক আমল না থাকে তাহলে তাদের ওপর বদ আমল চাপিয়ে দেওয়া সত্য ও সংগত।

٣٧. وَالْجَنَّةُ وَالنَّارُ مَخْلُوْقَتَانِ الْيَوْمَ لَا تَفْنِيَانِ أَبَداً ، وَلَا تَمُوْتُ الْحُوْرُ الْعِيْنُ أَبَداً

৩৭. বিহিশত ও দোযখ বর্তমানে সৃষ্ট, কখনো তা লয় হবে না। আয়তলোচনা বিহিশতের হুরকুল কখনো মরবে না।

وَلَا يَفْنَى عِقَابُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَثَوَابُهُ سَرْمَداً ۔

আর কখনো বিলীন হবে না আল্লাহ্ তা'আলার শাস্তি আর তাঁর প্রতিদান হচ্ছে চিরায়ত।

٣٨. وَاللّٰهُ تَعَالٰى يَهْدِيْ مَنْ يَّشَاءُ فَضْلاً مِّنْهُ ، وَيُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ عَدْلاً مِنْهُ وَاِضْلَالُهٗ خُذْلَانُهٗ ،

৩৮. যাকে ইচ্ছা আল্লাহ্ তা'আলা সঠিক পথে পরিচালনা করেন, এ তাঁর অনুগ্রহ। এবং যাকে চান বিপথগামী করেন, এ তাঁর ইনসাফ। বিপথগামী করার প্রকৃত অর্থ কাউকে পরিত্যাগ করা।

وَتَفْسِيْرُ الْخُذْلَانِ أَنْ لَا يُوَفِّقَ الْعَبْدَ اِلٰى مَا يَرْضَاهُ مِنْهُ، وَهُوَ عَدْلٌ مِنْهُ

আর পরিত্যাগ করার মর্মার্থ হল, যে কাজ করলে আল্লাহ তা'আলা সন্তুষ্ট হন বান্দাকে সে কাজ করার তওফীক না দেওয়া। এ হল তাঁর ইনসাফ।

وَكَذَا عُقُوْبَةُ الْمَخْذُوْلِ عَلَى الْمَعْصِيَةِ .

এভাবে পরিত্যক্ত ব্যক্তিকে গুনাহের দরুণ শাস্তি প্রদান করাও তাঁর ইনসাফ।

٣٩. وَلَا يَجُوْزُ أَنْ نَقُوْلَ : اِنَّ الشَّيْطَانَ يَسْلُبُ الْاِيْمَانَ مِنَ الْعَبْدِ الْمُؤْمِنِ قَهْرًا وَجَبْرًا

৩৯. এ কথা বলা আমাদের জন্য বৈধ নয় যে, বল প্রয়োগ করে জোর-পূর্বক শয়তান বান্দার ঈমান ছিনিয়ে নেয়।

وَلٰكِنْ نَقُوْلُ : اَلْعَبْدُ يَدَعُ الْاِيْمَانَ ، فَحِيْنَئِذٍ يَسْلُبُهُ مِنْهُ الشَّيْطَانُ .

বরং আমরা এ কথা বলতে পারি যে, বান্দা ঈমান পরিত্যাগ করে আর তখন শয়তান তা নিয়ে নেয়।

٤٠. وَسُؤَالُ مُنْكَرٍ وَنَكِيْرٍ حَقٌّ كَائِنٌ فِى الْقَبْرِ . وَاِعَادَةُ الرُّوْحِ اِلٰى جَسَدِ الْعَبْدِ فِيْ قَبْرِهٖ حَقٌّ .

৪০. কবরে মুনকার ও নাকীরের প্রশ্ন প্রতিষ্ঠিত সত্য। কবরে বান্দার দেহের মধ্যে আত্মার প্রত্যাবর্তন সত্য।

وَضَغْطَةُ الْقَبْرِ وَعَذَابُهٗ حَقٌّ كَائِنٌ لِلْكُفَّارِ كُلِّهِمْ وَلِبَعْضِ عُصَاةِ الْمُؤْمِنِيْنَ

সব কাফির ও কতক গুনাহগার মু'মিনের ওপর কবরের সংকোচন ও এর আযাব সত্য।

٤١. وَكُلُّ شَيْءٍ ذَكَرَهُ الْعُلَمَاءُ بِالْفَارِسِيَّةِ مِنْ صِفَاتِ اللّٰهِ تَعَالٰى عَزَّ اِسْمُهٗ فَجَائِزُ الْقَوْلِ بِهٖ

৪১. মহিমান্বিত মহান আল্লাহ্ তা'আলার গুণাবলী সম্পর্কে পণ্ডিতরা ফারসী ভাষায় যেসব বর্ণনা দিয়েছেন তা বৈধ,

سِوَى الْيَدِ بِالْفَارِسِيَّةِ ، وَيَجُوْزُ أَنْ يُقَالَ : "بروى خداى عَزَّ وَجَلَّ"
بِلاَ تَشْبِيْهٍ وَلاَ كَيْفِيَّةٍ .

কেবল 'আল্লাহ্‌র হাত' এর ফারসী অনুবাদ ছাড়া। তুলনা ও উপমা ছাড়া একথাও বলা যাবে : 'মহান খোদার ওয়াস্তে'।

وَلَيْسَ قُرْبُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَلاَ بُعْدُهُ مِنْ طَرِيْقِ طُوْلِ الْمَسَافَةِ وَقِصَرِهَا ،

আল্লাহ্ তা'আলার নৈকট্য ও তাঁর দূরত্ব দীর্ঘত্ব বা হ্রাস্বত্ব পরিমাণের নিরিখে নয়।

وَلٰكِنَّ عَلٰى مَعْنَى الْكَرَامَةِ وَالْهَوَانِ وَالْمُطِيْعُ قَرِيْبٌ مِنْهُ بِلاَ كَيْفٍ ،
وَالْعَاصِيْ بَعِيْدٌ عَنْهُ بِلاَ كَيْفٍ ،

বরং তা হল মর্যাদা ও অমর্যাদার নিরিখে। অনুগত ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী কোন বিশ্লেষণ ছাড়া। আর গুনাহগার ব্যক্তি আল্লাহ্ থেকে দূরে কোন বিশ্লেষণ ছাড়া।

وَالْقُرْبُ وَالْبُعْدُ وَالْإِقْبَالُ يَقَعُ عَلَى الْمُنَاجِيْ .

নৈকট্য, দূরত্ব ও অগ্রগামীতা বিনীত প্রার্থনাকারীর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

وَكَذٰلِكَ جِوَارُهُ فِي الْجَنَّةِ وَالْوُقُوْفُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِلاَ كَيْفِيَّةٍ .

এভাবেই বিহিশতে আল্লাহ্‌র পাশে ও তাঁর সম্মুখে অবস্থান এসবই বিশ্লেষণ ছাড়া।

٤٢ . وَالْقُرْآنُ مُنَزَّلٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فِي
الْمَصَاحِفِ مَكْتُوْبٌ ،

৪২. আল-কুরআন রাসূল (সা)-এর ওপর নাযিল হয়েছে এবং মসহাফে লিপিবদ্ধ।

وَآيَاتُ الْقُرْآنِ فِيْ مَعْنَى الْكَلَامِ كُلُّهَا مُسْتَوِيَةٌ فِي الْفَضِيْلَةِ وَالْعَظْمَةِ

কুরআনের আয়াতসমূহ আল্লাহ্‌র কালামের অর্থে মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্বে সমান।

إِلَّا أَنَّ لِبَعْضِهَا فَضِيْلَةَ الذِّكْرِ وَفَضِيْلَةَ الْمَذْكُوْرِ مِثْلَ آيَةِ الْكُرْسِيِّ

তবে এর কতকের রয়েছে বর্ণনা ও বর্ণিতের মর্যাদা, যেমন আয়াতুল কুরছি।

لِأَنَّ الْمَذْكُوْرَ فِيْهَا جَلَالُ اللّٰهِ تَعَالٰى وَعَظْمَتُهُ وَصِفَاتُهُ ، فَاجْتَمَعَتْ فِيْهَا
فَضِيْلَتَانِ –

কেননা এতে বর্ণিত হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার মহিমা, শ্রেষ্ঠত্ব ও গুণাবলী। সুতরাং এতে সন্নিবেশিত হয়েছে দুটো মর্যাদা--

فَضِيْلَةَ الذِّكْرِ وَفَضِيْلَةَ الْمَذْكُوْرِ ، وَلِبَعْضِهَا فَضِيْلَةُ الذِّكْرِ فَحَسْبُ مِثْلُ قِصَّةِ الْكُفَّارِ وَلَيْسَ لِلْمَذْكُوْرِ فِيْهَا فَضْلٌ وَهُمُ الْكُفَّارُ

বর্ণনার মর্যাদা এবং বর্ণিতের মর্যাদা। এবং কতক আয়াতে রয়েছে শুধু বর্ণনার মর্যাদা, যেমন কাফিরদের কাহিনী। এতে বর্ণিতের কোন মর্যাদা নেই, কারণ তারা হল কাফির।

٤٣. وَكَذٰلِكَ الْأَسْمَاءُ وَالصِّفَاتُ كُلُّهَا

৪৩. অনুরূপ মহান আল্লাহ্‌র নামসমূহ ও গুণসমূহ

٤٤. مُسْتَوِيَةٌ فِي الْعَظْمَةِ وَالْفَضْلِ لَاتَفَاوُتَ بَيْنَهُمَا

সম্মানে ও মর্যাদায় সমান, কোন পার্থক্য নেই এতে।

وَأَبُوْ طَالِبٍ عَمُّهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبُوْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَاتَ كَافِرًا

৪৪. আবূ তালিব, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা এবং আলী (রা)-এর পিতা কাফির অবস্থায় মারা যান।

٤٥. وَقَاسِمٌ وَطَاهِرٌ وَابْرَاهِيْمُ كَانُوْا بَنِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

৪৫. কাসিম, তাহির ও ইবরাহীম রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর পুত্র।

وَفَاطِمَةُ وَرُقَيَّةُ وَزَيْنَبُ وَأُمُّ كُلْثُوْمٍ كُنَّ جَمِيْعًا بَنَاتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَضِيَ عَنْهُنَّ

ফাতিমা, রুকাইয়া, যায়নাব ও উম্মু কুলসুম তাঁর কন্যা। আল্লাহ্ এদের প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন।

٤٦. وَإِذَا أَشْكَلَ عَلَى الْإِنْسَانِ شَيْءٌ مِنْ دَقَائِقِ عِلْمِ التَّوْحِيْدِ

৪৬. যখনই কোন মানুষের মনে তওহীদের জ্ঞান সম্পন্ন কোন প্রশ্নের উদ্রেক হয় তখনই তার উচিত

فَإِنَّهُ يَنْبَغِيْ لَهُ أَنْ يَعْتَقِدَ فِي الْحَالِ مَا هُوَ الصَّوَابُ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَىٰ إِلَّا أَنْ يَجِدَ عَالِمًا فَيَسْأَلَهُ

তাৎক্ষণিকভাবে দৃঢ় প্রত্যয় স্থাপন করা যা আল্লাহ্‌র কাছে সত্য তার ওপর, যতক্ষণ না সে কোন বিজ্ঞ ব্যক্তির সন্ধান পায়, যার কাছে সে সত্য জেনে নিবে।

وَلَا يَسَعُهُ تَأْخِيْرُ الطَّلَبِ وَلَا يُعْذَرُ بِالْوَقْفِ فِيْهِ ، وَيَكْفُرُ إِنْ وَقَفَ

এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করতে দেরী করার অবকাশ নেই। এ ব্যাপারে চুপ করে বসে থাকা কৈফিয়ত নয়। যদি চুপ করে বসে থাকে তাহলে সে কাফির হবে।

٤٧. وَخَبَرُ الْمِعْرَاجِ حَقٌّ ، وَمَنْ رَدَّهُ فَهُوَ مُبْتَدِعٌ ضَالٌّ

৪৭. মি'রাজের সংবাদ সত্য। যে এটা অস্বীকার করে সে তো বিদ'আতী ও বিপথগামী।

٤٨. وَخُرُوجُ الدَّجَّالِ وَيَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ وَطُلُوعُ الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا وَنُزُولُ عِيْسٰى عَلَيْهِ السَّلَامُ مِنَ السَّمَاءِ

৪৮. দাজ্জালের আবির্ভাব ও ইয়াজুজ ও মাজুজের আগমন, পশ্চিমে সূর্যোদয়, আসমান থেকে ঈসা (আ)-এর অবতরণ

وَسَائِرُ عَلَامَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ عَلٰى مَا وَرَدَتْ بِهِ الْأَخْبَارُ الصَّحِيْحَةُ حَقٌّ كَائِنٌ

এবং কিয়ামতের অন্যান্য আলামত, যা সহীহ্ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে তা সবই যথার্থ সত্য।

٤٩. وَاللّٰهُ تَعَالٰى يَهْدِىْ مَنْ يَّشَاءُ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ .

৪৯. আল্লাহ্ তা'আলা যাকে ইচ্ছা করেন সঠিক পথে পরিচালিত করেন।

আল-ফিক্‌হুল আক্‌বরের ব্যাখ্যা

১. তওহীদ

ইমাম আ'যম আবূ হানীফা (র)-এর সঙ্গে তওহীদ সম্পর্কে আলোচনার জন্য একদল দার্শনিক এলেন। তাঁরা বিশেষ করে তওহীদুর রাবুবিয়্যাত প্রতিষ্ঠার অনুকূলে জানতে চাইলেন। তিনি বললেন ঃ সর্বাগ্রে আপনারা আমাকে ঐ কিস্তিটি সম্পর্কে বলুন যেটি দজলা নদীতে চলাচল করে ; খাদ্যদ্রব্য, আসবাবপত্র ও নানা ধরনের পণ্য সামগ্রী বোঝাই করে ; যথাস্থানে খালাস করে ; ঘাটে-ঘাটে ভিড়ে ; নোঙ্গর করে ; আবার ফিরে আসে এবং এসবই আপন থেকে হচ্ছে, কেউ তদারকি করছে না। দার্শনিকরা বললেন ঃ না, না, এ হতে পারে না। এতো অসম্ভব কথা। তখন ইমাম আ'যম বললেন ঃ কিস্তির ব্যাপারে এরূপ কাজ অসম্ভব হলে মহাবিশ্বের ব্যাপারে তা হবে না কেন ? অর্থাৎ চালক ছাড়া যেমন কিস্তি চলতে পারে না, স্রষ্টা ও প্রতিপালক আল্লাহ্ ছাড়াও তেমনি এ মহাবিশ্ব পরিচালিত হতে পারে না।

সূরা ফাতিহাতে আল্লাহ্‌র পরিচয় দিতে গিয়ে রব এর কথা বলা হয়েছে। রবের পরিচয়ের উপর নির্ভর করে আল্লাহ্‌র পরিচয়। বান্দা যখন আল্লাহ্‌র পরিচয় লাভ করবে তখন তাঁর ইবাদত করা বান্দার জন্য জরুরী হবে। মোদ্দাকথা তওহীদুল 'উবুদিয়াতের জন্য তওহীদুর রবুবিয়্যাত জরুরী। আল-কুরআন শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত এ দুধরনের তওহীদের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। কখনো আল কুরআনে আল্লাহ্‌র যাত, সিফাত, নাম ও কর্ম সম্পর্কে উল্লেখ করা হয়েছে, যা তওহীদে ইলমী। কখনো বান্দাদের প্রতি তাঁর ইবাদতের দাওয়াত এবং তাঁকে ছাড়া অন্য কারো ইবাদত না করার কথা বলা হয়েছে, এ হলো তওহীদ তলবী। আল কুরআনের যাবতীয় আদেশ ও নিষেধ তওহীদের হক ও পরিপূর্ণতা বিধানের নিমিত্ত। আল কুরআনে আহলে তওহীদের মর্যাদা, দুনিয়াতে ও আখিরাতে তাঁদের প্রতি যে সম্মানজনক আচরণের কথা উল্লেখিত আছে তা, তওহীদের প্রতিদানের কথা। পক্ষান্তরে তওহীদ বিরোধী শিরককারীদের অবস্থা এবং দুনিয়া ও আখিরাতে তাদের যেসব আযাবের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, তা হলো তওহীদ বিরোধিতার প্রতিফলের বর্ণনা।

সূরা ফাতিহার কথাই ধরা যাক। আল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন-সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র, যিনি প্রভু সারা জাহানের। এ তো তওহীদের প্রথম ঘোষণা। আর রাহমান আর রাহীম এ-ও তওহীদের ঘোষণা। মালিক ইয়াওমিদ্দীন-তওহীদেরই ঘোষণা। ইয়্যাকা না'বুদু অ-ইয়্যাকা নাস্‌তা'ঈন-একমাত্র তোমারই ইবাদত করি এবং তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি, বান্দার তরফ থেকে বন্দেগীর তওহীদের ঘোষণা। শেষে হিদায়াতের প্রার্থনা, স্রষ্টার কাছে সৃষ্টির আবেদন-নিবেদনের তওহীদের ঘোষণা। বান্দা আল্লাহ্‌র কাছে এবং শুধু আল্লাহ্‌রই কাছে হিদায়াত চাইছে সে পথের, যে পথে

আহ্‌লে তওহীদরা চলে তাঁর নিয়ামত লাভ করেছে। কিন্তু সে পথ নয়, যে পথে তওহীদ বিরোধীরা বিভ্রান্ত ও অভিশপ্ত হয়েছে।

ইমাম আ'যম তাওহীদ সম্পর্কে বলতে গিয়ে এর মূল এবং কিভাবে ও কোন্ কোন্ বিষয় ঈমান রাখা জরুরী, তার বর্ণনা দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র সত্ত্বা ও বিদ্যমানতা সম্পর্কে বলেন নি। কারণ তা প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত। আসমান ও যমীনের স্রষ্টা কে, জানতে চাইলে কাফিররা উত্তর দিত 'আল্লাহ'। তাছাড়া সৃষ্টির প্রকৃতিতেই আল্লাহ্‌র অস্তিত্বের প্রমাণ বিদ্যমান। তাই সমস্ত নবী, রাসূলরা আল্লাহ্‌র ইবাদত ও তাঁর সঙ্গে শরীক না করার শিক্ষা মানুষদের দিয়ে গেছেন। পক্ষান্তরে তওহীদের বর্ণনার মধ্যেই সত্ত্বার অস্তিত্বের বর্ণনা বিদ্যমান।

২. ঈমান

ইমাম আ'যম বলেন ঃ প্রত্যেক মুকাল্লাফের[১] জন্য ওয়াজিব যে, সে বলবে, "আমি ঈমান আনলাম আল্লাহ্‌র প্রতি, তাঁর ফিরিশতাদের প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের ওপর, তাঁর রাসূলদের ওপর, মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ায়, অদৃষ্টের ওপর-যার ভাল-মন্দ সবই আল্লাহ্‌র তরফ থেকে, হিসাব, মীযান, বিহিশত ও দোযখের ওপর, এসবই সত্য।" প্রত্যেক প্রাপ্ত বয়স্ক ও জ্ঞান সম্পন্ন ব্যক্তির ওপর অবশ্য কর্তব্য যে, সে সজ্ঞানে নিজের মুখে মনে-প্রাণে ঈমানের বাক্য উচ্চারণ করবে। ঈমানের আহকাম জারীর ব্যাপারে ইক্‌রার শর্ত। তবে ওযরের কারণে ইক্‌রারের শর্ত কখনো স্থগিত থাকে। কিন্তু বিনা ওযরে কেউ ইক্‌রার না করলে সে ঈমানদার বলে গণ্য হবে না। ইমামের কথায় ইঙ্গিত রয়েছে যে, ঈমানের জন্য 'আশ্‌হাদু ...' বলার প্রয়োজন নেই। ইমাম শাফিঈর মতে 'আশ্‌হাদু' বলা ঈমানের জন্য শর্ত।

আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান আনার অর্থ ঃ মনে প্রাণে আল্লাহ্‌র সত্ত্বা ও বিদ্যমানতায় বিশ্বাস করা, তাঁর পবিত্রতায় বিশ্বাস করা, তাঁর সত্ত্বার একত্বতায় বিশ্বাস করা, তাঁর সিফাত সমূহে বিশ্বাস করা।

ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান আনার অর্থ ঃ তাঁরা আল্লাহ্‌র সম্মানিত বান্দা, আল্লাহ্‌র নির্দেশে তাঁরা কাজ করে, কোন কিছুই তাঁর নির্দেশের বাইরে করে না, তাঁরা নিষ্পাপ, কখনো আল্লাহ্‌র অবাধ্যতা করে না, তাঁরা নরও নয়, নারীও নয়, তাঁরা যে কোন আকার ধারণ করতে পারেন।

কিতাবের প্রতি ঈমান আনার অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র তরফ থেকে এসব কিতাব নাযিল হয়েছে, যেমন তওরাত, যাবুর, ইন্‌জিল ও আল-কুরআন এবং এছাড়া অন্যান্য অগণিত সহীফা, যার সংখ্যা জানা নেই।

---

১. প্রাপ্ত বয়স্ক ও জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি।

রাসূলদের প্রতি ঈমান আনার অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র প্রেরিত তামাম আম্বিয়ার প্রতি ঈমান রাখা। এখানে রাসূল শব্দটি নবী ও রাসূল উভয় অর্থে ব্যবহৃত।

মৃত্যুর পর জীবিত হওয়ার প্রতি ঈমান আনার অর্থ ঃ ভৌতিক আকৃতি ধ্বংস হওয়ার পর পুনরায় জীবিত হওয়া। হাশর, নশর সবই এর মধ্যে শামিল। দীনের জরুরী বিষয়সমূহের মধ্যে হাশরের প্রতি ঈমান অন্যতম এবং তা অস্বীকার করা কুফ্‌রী। بعث بعد الموت (মৃত্যুর পর জীবিত করার) দ্বারা اليوم الاخر বুঝান হয়েছে। بعث بعد الموت ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়, যেমন মৃত্যুর পরে কবরে অবস্থান, কবর থেকে উত্থান, হাশরের বিভিন্ন অবস্থা, ছাওয়াব ও আযাব ইত্যাদি। কোন কোন কপিতে بعث بعد الموت এর সঙ্গে اليوم الاخر ও উল্লেখ আছে। তখন بعث بعد الموت দ্বারা কবরে অবস্থানের পর জীবিত করাকে এবং اليوم الاخر দ্বারা কিয়ামতের যাবতীয় অবস্থাকে বুঝবে।

অদৃষ্টে ঈমান আনার অর্থ ঃ আল্লাহ্‌র হুকুমে সবকিছু সংঘটিত হয়। এর ভাল-মন্দ সংঘটিত হবার স্থান-কাল, এর ওপর বর্তিত ছাওয়াব ও আযাব সবকিছুই আল্লাহর তরফ থেকে। মৃত্যুর পর পুনরায় জীবিত হওয়া তথা আখিরাতের ওপর ঈমানের কথার পর কিয়ামতের বিভিন্ন বিষয় ও অবস্থার উল্লেখ করা হয়েছে, যার ওপর ঈমান আনা জরুরী। এসবের মধ্যে কৃতকর্মের হিসাব, কৃতকর্মের পরিমাপের জন্য মীযান বা তুলাদণ্ড, কৃতকর্মের প্রতিদান ও প্রতিফলের জন্য বিহিশত ও দোযখ ইত্যাদি বিবৃত হয়েছে।

৩. আল্লাহ্ তা'আলা

আল্লাহ্ তা'আলা এক। আল্লাহ্ তাঁর সত্তার দিক দিয়ে এক। একথা নয় যে, তিনি ছাড়া অন্য কোন এক আল্লাহ্ আছে। বরং তিনি এক এদিক দিয়ে যে, তাঁর কোন অংশীদার নেই--না সত্তার দিক দিয়ে, না সিফাতের দিক দিয়ে, না সাদৃশ্যের দিক দিয়ে। আল্লাহ্‌র পরিচয় আল-কুরআনে ১১২ নং সূরা ইখলাসে এভাবে দেয়া হয়েছে ; তিনি আল্লাহ্, এক। আল্লাহ্ মুখাপেক্ষী নন কারো, সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি কাউকে জন্ম দেননি এবং তাঁকেও জন্ম দেয়া হয়নি। নেই তাঁর সমতুল্য কেউ। আল্লাহ্ তা'আলা সম্পর্কে মানুষের যে সব অলীক ও উদ্ভট ধ্যান-ধারণা আবহমানকাল ধরে চলে আসছে, এখানে তা অপনোদন করা হয়েছে। মক্কার কাফিররা মনে করতো যে, ফিরিশতারা আল্লাহ্‌র কন্যা ; ইয়াহুদীরা মনে করতো যে, উযায়ের (আ) আল্লাহ্‌র পুত্র ; নাছারারা মনে করতো যে, ঈসা (আ) আল্লাহ্‌র পুত্র ও তাঁর মা মারঈয়াম (আ) আল্লাহ্‌র সহধর্মিণী।

তিনি অতুলনীয় ঃ সৃষ্টির কোন কিছুর সাদৃশ্য তিনি নন, আর সৃষ্টির কোন বস্তুও তাঁর সাদৃশ্য নয়। কোন কিছুই তাঁর মত নয়। আল্লাহ্ বে-নিয়াজ। তাঁর কোন কিছুর

প্রয়োজন নেই। সকলেই তাঁর মুখাপেক্ষী। তিনি 'ওয়াজিবুল অজূদ'--যার হওয়া জরুরী, এবং তিনি ছাড়া সবসৃষ্টি 'মুমকিনুল অজূদ'-যার হওয়া না হওয়া সমান।

তিনি অনাদি, তিনি অনন্ত ঃ তিনি চিরবিদ্যমান তাঁর নামসমূহ ও গুণাবলী নিয়ে। এসবের কতক সত্তাগত আর কতক গুণগত। যেমন জীবন, শক্তি, জ্ঞান, কথা, শ্রবণ, দর্শন, ইচ্ছা--এগুলো আল্লাহ্র যাতী, সিফাত বা সত্তাগত গুণ। আর সৃষ্টি করা, আহার্য দান করা, আরম্ভ করা, উদ্ভাবন করা, তৈরি করা ইত্যাদি তাঁর ক্রিয়াগত গুণ বা সিফাতে ফে'লিয়া।

এ দু'ধরনের সিফাত সম্পর্কে দার্শনিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে। আশ'আরীরা মনে করেন, যেসব সিফাত নঞর্থক করলে বিপরীত অর্থ দেয়, তা জাতী বা সত্তাগত। যেমন জীবন--হায়াত--এর বিপরীত মৃত্যু। শক্তি--কুদরত-এর বিপরীত দুর্বলতা। জ্ঞান 'ইলম-এর বিপরীত অজ্ঞতা। আর যে সব সিফাতের নঞর্থক করলে বিপরীত অর্থ বুঝায়না, তা ক্রিয়াগত বা ফে'লী। যেমন সাহায্য দান করা, উদ্ভাবন করা ইত্যাদি। মু'তাযিলাদের মতে সে সব সিফাত ফে'লী--ক্রিয়াগত, যা হাঁ-সূচক ও না-সূচক হতে পারে, যেমন আল্লাহ্ অমুককে সন্তান দিয়েছেন, অমুককে দেননি ; অমুককে আহার্য দিয়েছেন অমুককে দেননি ইত্যাদি। আর যে সিফাতের ক্ষেত্রে 'না' ব্যবহৃত হতে পারে না, তা 'জাতী' বা সত্তাগত। যেমন জ্ঞান, 'ইলম ও শক্তি-কুদরত। এরূপ বলা যায় না যে, আল্লাহ্ তা জানেন না অথবা ঐ জিনিসের শক্তি রাখেন না। ইমাম আবূ মানসূর আল-মাতুরিদীর মতে, যে সিফাতের বিপরীত সিফাত দিয়ে আল্লাহ্কে বিশেষিত করা যায় না, তা জাতী বা সত্ত্বাগত সিফাত। যেমন কুদরত, ইলম, ইজ্জত, আযমত ইত্যাদি। আর যেসব সিফাত ও তার বিপরীত অর্থ জ্ঞাপক সিফাত দিয়ে আল্লাহ্কে বিশেষিত করা যায়, তা ফে'লী বা ক্রিয়াগত। যেমন রাহমত, গযব, ইত্যাদি। ক্রিয়াগত সিফাতের প্রকাশ বস্তুর অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পৃক্ত।

৪. অনাদিকাল থেকে আল্লাহ্ তা'আলা সিফাতে জাতী ও সিফাতে ফে'লী দ্বারা বিশেষিত

আল্লাহ্ তা'আলা অনাদিকাল থেকে তাঁর যাবতীয় সুন্দর সুন্দর নাম ও সিফাত সহ বিদ্যমান। তাঁর এসব নাম ও সিফাতের কোন আদি নেই, কোন অন্ত নেই। কোন নতুন নাম কিংবা নতুন সিফাত তাঁর জন্য প্রয়োগ করা যাবে না। আল্লাহ্ অনাদিকাল থেকে স্বীয় জ্ঞানে জ্ঞানবান। এ জ্ঞান তাঁর অনাদিকালের। যে জ্ঞানের পূর্বে অজ্ঞতা অপরিহার্য, এ জ্ঞান সেরূপ নয়। আল্লাহ্র ইল্ম বা জ্ঞান সৃষ্টির জ্ঞানের মত হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনা থেকে পবিত্র ও মুক্ত। এভাবে তিনি স্বীয় শক্তিতে শক্তিমান এবং এ শক্তি অনাদিকাল থেকে তাঁর স্থায়ী সিফাত। তিনি স্বীয় পবিত্র কালামে বাজ্ময় এবং এ তাঁর

স্থায়ী ও অনাদি সিফাত। তিনি কর্তা স্বীয় ক্রিয়ায় এবং তাঁর এ ক্রিয়া স্থায়ী ও অনাদি সিফাত। কিন্তু কর্ম হ্‌লো মাখ্‌লূক বা সৃষ্ট যা নশ্বর। আর আল্লাহ্‌ অবিনশ্বর। তাই তাঁর ক্রিয়াও অবিনশ্বর। কর্ম সৃষ্ট হওয়ার দরুণ ক্রিয়াও সৃষ্ট হ্‌তে হবে এমন নয়। আল্লাহ্‌ তা'আলার সমস্ত সিফাত অনাদিকাল থেকে স্থায়ীভাবে বিদ্যমান। এসব তাঁর চিরন্তনী ও অবিনশ্বর গুণ। এর কোনটিই সৃষ্ট নয়। তাই যে বলে ঃ আল্লাহ্‌র সিফাতসমূহ সৃষ্ট কিংবা নশ্বর অথবা এ ব্যাপারে মত প্রকাশে ইতস্তত করে বা চুপ থাকে, অথবা সন্দেহ পোষণ করে, সে তো কাফির।

৫. আল-কুরআন

আল-কুরআন আল্লাহ্‌ তা'আলার কালাম যা অবিনশ্বর। এ কুরআন বর্ণ ও বাক্যের আবরণে গ্রন্থে লিপিবদ্ধ, অন্তরে সুরক্ষিত, রসনায় পঠিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহিস সালাত ওয়াস সালামের ওপর নাযিলকৃত। কুরআনের ব্যাপারে সম্পৃক্ত মানুষের যাবতীয় ক্রিয়া যেমন উচ্চারণ, মুখস্তকরণ, পঠন, লিখন ইত্যাদি সৃষ্ট। কেননা যে সৃষ্ট তার ক্রিয়াও সৃষ্ট। আর যা সৃষ্ট তা নশ্বর। কিন্তু আল্লাহ্‌র কালাম হিসাবে আল কুরআন সৃষ্ট নয়। অনাদি অনন্ত অবিনশ্বর।

আল্লাহ্‌ তা'আলা আল-কুরআনে মূসা (আ) ও অন্যান্য নবীদের এবং ফিরআউন, ইবলীস, হামান ও কারুনের মত অবাধ্যদের যেসব ঘটনা বর্ণনা করেছেন, তা তাদের সংবাদ সম্বলিত আল্লাহ্‌র কালাম। আসমান ও যমীন সৃষ্টির বহুপূর্বে লওহে মাহফূযে এসব কথা লিখিত ও সুরক্ষিত আছে। যখন ঘটনা সংঘটিত হয়েছে তখন তা লওহে মাহ্‌ফূযে যা লিখিত আছে, সে মতই হয়েছে। আল কুরআনের বর্ণনা ও বিষয়গত দিক দিয়ে আল্লাহ্‌র কালাম হিসাবে কোন পার্থক্য নেই। ঘটনার বর্ণনা যেমন আবূ লাহাবের কথা, যুদ্ধের বর্ণনা, পূর্ববর্তী অবাধ্য উম্মতের বর্ণনা ইত্যাদি, আবার আল্লাহ্‌র যাত ও সিফাতের বর্ণনা, তাঁর কুদরত ও আযমতের বর্ণনা যেমন আয়াতুল কুরসী ও সূরা ইখলাস, এসবই আল্লাহ্‌র কালাম। সবই শাশ্বত, অনাদি, স্থায়ী। মূসা (আ) ও ফিরিশতাদের আল্লাহ্‌র সঙ্গে কথা বলা সৃষ্ট ও নশ্বর। কেননা একথা বলা ছিল তাদের উচ্চারণ, যা লওহে মাহফূযের লেখার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। তাদের কথা হিসাবে এসব সৃষ্ট ও নশ্বর এবং আল্লাহ্‌র কালাম হিসাবে অবিনশ্বর। আল-কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম এতে অন্য কারো কালাম নেই। বিশেষণ তো সর্বদা বিশেষ্যের অনুগত। হিব্রু মতনের তওরাত এবং আরবী মতনের কুরআন আল্লাহ্‌র কালাম। পৃথক ভাষা হওয়ার কারণে আল্লাহ্‌র কালাম পৃথক হয়নি।

৬. আল্লাহ্‌ তা'আলার সিফাত সৃষ্ট জীবের সিফাতের সাদৃশ্য নয়

আল-কুরআনের সূরা নিসা ঃ ৪, আয়াত ঃ ১৬৪ তে বর্ণিত হয়েছে যে—"অনেক রাসূল পাঠিয়েছি যাদের কথা বলেছি আপনাকে আগে এবং অনেক রাসূল যাদের কথা

আপনাকে বলিনি। আর কথা বলেছিলেন আল্লাহ্ মূসার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে। মূসা (আ) আল্লাহ্র কথা সরাসরি শুনেছিলেন। তবে পর্দার আড়ালে থেকে। এজন্যই তো তিনি বলেছিলেন ঃ হে আমার রব! দেখা দাও আমাকে, আমি প্রত্যক্ষ করব তোমাকে।" আল্লাহ্ তো অনাদিকাল থেকেই কথা বলেন, কিন্তু মূসা (আ) তো তদ্রূপ নন। তাকে তো তখন সৃষ্টিও করা হয়নি। যেমন আল্লাহ্ তো শাশ্বত স্রষ্টা। অনাদিকাল থেকেই তিনি স্রষ্টা যখন পয়দা করা হয়নি সৃষ্টি। সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ্ স্রষ্টা। মাখলূকের সৃষ্টির ওপর স্রষ্টার নাম নির্ভরশীল নয়। যেমন 'মৃতকে জীবনদানকারী' নামের জন্য মৃতকে জীবিত করার প্রয়োজন হয় না। তেমনি 'মাখলূকের স্রষ্টা' নামের জন্য সৃষ্টির দরকার হয় না। তার পূর্বেই 'স্রষ্টা' নাম প্রযোজ্য। কেননা তিনি সর্বশক্তিমান। সবাই তাঁর মুখাপেক্ষী। কোন কিছুই তাঁর মত নয়--না সত্তার দিক দিয়ে, না গুণের দিক দিয়ে। আল্লাহ্ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। কেউ আল্লাহ্কে তাঁর সৃষ্টির সাথে সত্তার দিক দিয়ে অথবা গুণের দিক দিয়ে তুলনা করলে বা সাদৃশ্য বানালে কাফির হয়ে যাবে। আর কেউ আল্লাহ্র সেসব সিফাত যা তিনি নিজের জন্য বর্ণনা করেছেন, অস্বীকার করলে কাফির হয়ে যাবে। যেহেতু আল্লাহ্ শাশ্বত ও অবিনশ্বর, আর সব কিছু নশ্বর ও অনিত্য। তাই কোন কিছুই তাঁর সাদৃশ্য হতে পারে না, না গুণের দিক দিয়ে, না নামের দিক দিয়ে, আর না সত্তার দিক দিয়ে। শ্রবণ, দর্শন, জ্ঞান, শক্তি, কথন ইত্যাদি স্রষ্টা ও সৃষ্টির সিফাত, কিন্তু যখন এসব আল্লাহ্র সিফাত, তখন তা সৃষ্টির সিফাত থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। যেমন তিনি জানেন। তাঁর জানা আমাদের জানার মত নয়। তিনি শক্তি রাখেন, তাঁর শক্তি আমাদের শক্তির মত নয়। তিনি দেখেন, তাঁর দেখা আমাদের দেখার মত নয়। তিনি শুনেন, তাঁর শুনা আমাদের শুনার মত নয়। তিনি বলেন, তাঁর বলা আমাদের বলার মত নয়। কোন কিছু সম্পর্কে আমরা উপকরণের মাধ্যমে জ্ঞান আহরণ করি। কিন্তু আল্লাহ্ তা জানেন কোন উপকরণ ছাড়াই। আমরা কোন কিছু করার শক্তি রাখি সামর্থ্য অনুযায়ী বিভিন্ন উপায় উপকরণের সহায়তায়। কিন্তু তিনি সর্বশক্তিমান। তাঁর এসবের কিছুরই প্রয়োজন হয় না। আমরা বিভিন্ন আকৃতি ও রঙ দেখি, বিভিন্ন আওয়াজ ও বাক্য শুনি আমাদের দেহে সৃষ্ট শ্রবণেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'আলা কোন উপকরণ ছাড়াই দেখেন ও শুনেন। আমরা যখন কথা বলি তখন জিহ্বা, ঠোঁট, দাঁত, বর্ণ, বাক্য, শব্দ ইত্যাদির প্রয়োজন হয়। কিন্তু আল্লাহ্ সুবহানাহু ওয়া তা'আলার জন্য এর কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই।

আল কুরআন আল্লাহ্র কালাম। মানুষের কালাম নয়। আল্লাহ্র কালামকে মানুষের কথা মনে করলে কি শাস্তি তা সূরা মুদ্দাচ্ছির ঃ ৭৪, আয়াত ঃ ২৫-২৯ এ বর্ণিত হয়েছে। কুরায়েশ সরদার ওলীদ ইবন মুগীরা বলেছিল ঃ এ কুরআন তো মানুষের

কথা ছাড়া কিছু নয়। আল্লাহ্ বললেন ঃ আমি তাকে নিক্ষেপ করব সাকার নামক জাহান্নামে, তুমি কি জান 'সাকার' কি ? তা ওদের জীবিতও রাখবে না আর মেরেও ফেলবে না। তা ওদের গায়ের চামড়া জ্বালিয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিবে। সাকারের তত্ত্বাবধানে রয়েছে ১৯ জন প্রহরী। আমরা বিশ্বাস করি, আল-কুরআন মানুষের স্রষ্টা মহান আল্লাহ্‌র কালাম, যার সাদৃশ্য মানুষের কালাম কখনো হতে পারে না।

৭. আল্লাহ্ বস্তু তবে সৃষ্ট বস্তুর ন্যায় নন

আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা স্বীয় যাত ও সিফাতসহ বিদ্যমান। তবে তাঁর বিদ্যমানতা সৃষ্ট বস্তুর মত নয়। কোন বস্তুর অস্তিত্বের বিদ্যমানতার জন্য স্থান ও কাল অপরিহার্য। আর এ দু'টিই নশ্বর। আল্লাহ্ অনাদিকাল থেকে অনন্তকাল পর্যন্ত বিদ্যমান। তাঁর জন্য স্থান-কালের প্রয়োজন নেই। তাঁর নেই কোন অবয়ব, নেই কোন দেহ। দেহের জন্য আকৃতি দরকার, সংযোজন দরকার। এ সবই নশ্বর। তিনি অবিভাজ্য মৌল অণুও নন এবং এমন বস্তুও নন, যা অপরের সহায়তায় বিদ্যমানতা লাভ করে। তাঁর কোন শুরু নেই, কোন সীমা নেই। তাঁর কোন প্রতিপক্ষ নেই, যে তাঁকে কোন কিছু করা থেকে বারণ করতে পারে। তাঁর কোন জাতীয়তা নেই, নেই কোন শ্রেণী। নেই কোন ধরন, কোন গঠন।

আল-কুরআনে আল্লাহ্ তাঁর হাত, তাঁর চেহারা ও তাঁর নফস্ সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন। কমপক্ষে ১৫ বার হাত, ১০ বার চেহারা ও ৬ বার নফস্ উল্লেখিত হয়েছে। হাদীসে তো বহুবার এসেছে। এসবই যেমন উল্লেখ করা হয়েছে তেমনি তাঁর সিফাত। তবে এসবের ধরন ও প্রকৃতি কারো জানা নেই। কাদারিয়া ও মু'তাযিলারা এসব ব্যাপক অর্থে ব্যবহার করেন। তারা আল্লাহ্‌র 'হাত' দিয়ে তাঁর কুদরত ও নিয়ামত বুঝে। এ ব্যাখ্যা ঠিক নয়। এতে আল্লাহ্‌র সিফাতের অস্তিত্বকেই বাতিল বলে গণ্য করা হয়। মু'তাযিলারা মনে করে যে, আল্লাহ্ কাদীম-শাশ্বত। যদি তাঁর সিফাত স্বীকার করে নেয়া যায়, তাহলে একাধিক শাশ্বত সত্তার অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়। আর এরূপ হলে আল্লাহ্‌র একত্ব-তওহীদ থাকে না। তাদের এ বক্তব্য ঠিক নয়। কারণ আল্লাহ্‌র সিফাত তাঁর সত্তাও নয়, আর তার বিপরীতও নয়। সুতরাং আল্লাহ্‌র সিফাতের কারণে একাধিক শাশ্বত সত্তা হওয়া জরুরী নয়।

আল্লাহ্‌র ক্রোধ এবং আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি তাঁরই দুটি সিফাত। তবে এর প্রকৃতি কেমন তা জানা নেই। এমন অনেক সিফাত আছে, যা আল্লাহ ও মানুষ উভয় ক্ষেত্রেই ব্যবহৃত হয়। অর্থের দিক দিয়ে সামঞ্জস্য বিদ্যমান। যেমন জীবিত। আল্লাহ্‌র জন্য যখন حَيٌّ জীবিত সিফাত ব্যবহার করা হয় তখন এর ওপর যে মৃত্যু আসতে পারে তা কল্পনা করা যায় না। অথচ মানুষের জন্য যখন তা ব্যবহৃত হয় তখন মৃত্যু

অবধারিত। তাই একই সিফাত স্রষ্টা ও সৃষ্টির জন্য প্রয়োগ হতে পারে, তবে তা হবে প্রত্যেকের শান অনুযায়ী।

৮. আল্লাহ্ সুব্হানাহু সবকিছু সৃষ্টি করেছেন, তবে কোন বস্তু থেকে নয়

আসমান ও যমীনের যাবতীয় সৃষ্টি আল্লাহ্র। আলো, আঁধার, আনন্দ, বেদনা, ভাল, মন্দ, স্থবিরতা, চলমানতা, স্থিতি, অবস্থিতি, অণু, পরমাণু, পানি, মাটি, বাতাস, আগুন, এসবই তাঁর সৃষ্টি। এর কোনটিই এমন নয় যে, পূর্বে ছিল এমন উপাদান ও উপকরণ দিয়ে তা সৃষ্টি করা হয়েছে। এরজন্য না ছিল উপকরণ, না ছিল কোন নমুনা। কেননা একা তিনিই ছিলেন, আর কিছু ছিল না। অনস্তিত্ব থেকে তিনি সবকিছু অস্তিত্বে এনেছেন। পৃথিবীতে অস্তিত্ব লাভ ও প্রকাশের পূর্বেই প্রতিটি বস্তু সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলা জানতেন। বস্তুর অস্তিত্বের পূর্ব বিদ্যমানতা সে বস্তু সম্বন্ধে আল্লাহ্র জ্ঞানের জন্য জরুরী নয়। বস্তু নেই কিন্তু হবে ; কেমন হবে, কখন হবে ? এসবই আল্লাহ্র জ্ঞানায়ত্ত। একথাই আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ।

৯. সবকিছু আল্লাহ্ তা'আলা নির্ধারণ করেন ও নির্দেশ করেন

সূরা সাবা ৩৪, আয়াত ৩ এবং সূরা ইউনুছ ১০, আয়াত ৬১, তে বর্ণিত হয়েছে ঃ আল্লাহ্ অদৃশ্য সম্বন্ধে সম্যক পরিজ্ঞাত। আকাশ মণ্ডলী ও পৃথিবীতে তাঁর অগোচর নয় অণু পরিমাণ কিছু কিংবা তার চাইতে ক্ষুদ্র অথবা বৃহৎ কিছু, বরং এর প্রত্যেকটি লিপিবদ্ধ আছে লওহে মাহফূযে। আল্লাহ্ তা'আলা কোন কিছু সৃষ্টি করতে চাইলে স্বীয় ইচ্ছা এ ইরাদা অনুযায়ী তা নির্ধারণ করে দেন এবং অস্তিত্বের জন্য নির্দেশ দেন। সূরা নাহল ১৬, আয়াত ৪০, সূরা মারয়াম ১৯, আয়াত ৩৫, সূরা ইয়াসীন ৩৬, আয়াত ৮২, সূরা মুমিন ৪০, আয়াত ৬৮–এ বর্ণিত হয়েছে ঃ যখন আল্লাহ কোন কিছু করা স্থির করেন তখন তিনি বলেন, 'হও' আর তা হয়ে যায়। দুনিয়া ও আখিরাতে এমন কোন বস্তু নেই যা তাঁর ইচ্ছা, তাঁর জ্ঞান, তাঁর নির্দেশ, তাঁর নির্ধারণ ও তাঁর লিখন ব্যতিরেকে সংঘটিত হয়। লওহে মাহফূযে সবকিছু লিখিত থাকার অর্থ হলো, যে বস্তুর অস্তিত্ব নেই কিন্তু অস্তিত্বে আসবে, আল্লাহ্র জ্ঞানে তা রয়েছে। এমন নয় যে, লওহে মাহফূযে লিখিত আছে তাই তা সংঘটিত হবে, অস্তিত্ববান হবে।

'ক্বাযা' ও 'ক্বদর' এর একটি সাধারণ হুকুম, অপরটি বিশদ ব্যাখ্যামূলক হুকুম। 'মাশিয়াত' আল্লাহ্র ইরাদা ও ইচ্ছা। ক্বাযা, ক্বদর ও মাশিয়াত--এ তিনটি আল্লাহ্র শাশ্বত সিফাত। যেমন তাঁর অন্যান্য সিফাত। তবে এ তিনটি সিফাতের প্রকৃত মর্ম

সৃষ্টির কাছে স্পষ্ট নয়। একজন মু'মিনের ঈমান রাখতে হবে যে, মানুষের মেধা ও বুদ্ধি এর বর্ণনা ও ব্যাখ্যা দিতে অপারগ। আল্লাহ্ নিজের শানে যে অর্থে এর ব্যবহার করেছেন তার ওপর বিশ্বাস স্থাপন করাই মু'মিনের কর্তব্য।

আল্লাহ্ তা'আলা যে বস্তুর অস্তিত্ব নেই তা অস্তিত্বে আনলে কেমন হতো, তা যেমন জানেন, অনস্তিত্বময় বস্তুকেও অস্তিত্বে না থাকা অবস্থায় সেরূপ জানেন। যে বস্তুর অস্তিত্ব বিদ্যমান তা যেমন তিনি জানেন, তার বিলুপ্তি কিরূপ হবে তাও তিনি জানেন। কোন দাঁড়ানো ব্যক্তিকে তার দণ্ডায়মান অবস্থায় তিনি দাঁড়ানো হিসাবে জানেন। আর যখন সে বসে তখন তার বসা অবস্থায় তাকে তিনি উপবিষ্ট হিসাবে জানেন। এতে আল্লাহ্র জ্ঞানে কোন পরিবর্তন, পরিবর্ধন, সংযোজন বা বিয়োজন হয় না। এতে কোন নতুনত্ব সাধিত হয়না। যে বিবর্তন ও পরিবর্তন সংঘটিত হয়, তা সবই সৃষ্টির মাঝে হয়। আল্লাহ্ মহান পবিত্র। তিনি শাশ্বত। তাঁর জ্ঞানও শাশ্বত। সৃষ্টির মাঝে কোন পরিবর্তন সাধিত হলে তাঁর জ্ঞানে কোন নতুনত্ব আসবে না।

১০. সৃষ্টিকে ঈমান ও কুফর থেকে মুক্ত অবস্থায় সৃষ্টি করা হয়েছে

আল্লাহ্ তা'আলা মাখলূককে কুফরীর প্রভাব ও ঈমানের আলো থেকে মুক্ত অবস্থায় পয়দা করেছেন। তাদের মাঝে যোগ্যতা দিয়েছেন ভাল, মন্দ, আলো, আঁধার, পাপ, পুণ্য পার্থক্য করার ও গ্রহণ-বর্জন করার। সূরা তাগাবুন ৬৪, আয়াত ২ এ বর্ণিত হয়েছে ঃ আল্লাহ্ই তো তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। তারপর তোমাদের মধ্যে কেউ হয় কাফির আবার কেউ হয় মু'মিন। তোমরা যা কর আল্লাহ্ তার সম্যক দ্রষ্টা। মাখলূককে সৃষ্টি করার পর, আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর রাসূলদের মাধ্যমে ও তাঁদের পরে তাঁদের স্থলাভিষিক্তদের মাধ্যমে, তাঁর ইবাদতের জন্য সম্বোধন করেন। তাদের নির্দেশ দেয়া হয় ঈমান ও আনুগত্যের ; বারণ করা হয় কুফর ও অবাধ্যতা থেকে।

মানুষ নিজের ইচ্ছায় আল্লাহ্র নির্দেশ না মেনে, তাঁকে ছেড়ে, তাঁর সন্তুষ্টির তোয়াক্কা না করে, অহঙ্কার বশে, অবাধ্য হয়ে কুফরী করে। আবার কতক মানুষ তাঁর সন্তুষ্টির আশায়, নিজের কাজের মাধ্যমে, মুখের স্বীকৃতির মাধ্যমে ও অন্তরের প্রত্যয়ের মাধ্যমে ঈমান আনে। সূরা ইউনুস ১০, আয়াত ৪৪-এ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ যুলুম করেন না মানুষের প্রতি বিন্দুমাত্র, বস্তুত: মানুষ নিজেরাই যুলুম করে নিজেদের প্রতি। কুফরী করা নিজের প্রতি নিজে যুলুম করার শামিল। যে কুফরী করল সে তা নিজের ইচ্ছায় করল। আর যে ঈমান আনল সে তা নিজের ইচ্ছায় আনল। তাই কারো কাফির হওয়া ও কারো মু'মিন হওয়া আল্লাহ্র শাশ্বত 'ইলমের পরিপন্থী নয়। আল্লাহ্ তাদের কুফ্রী ও ঈমান সম্পর্কে পূর্ব থেকেই অবহিত। বস্তু জগতে তারা যথাসময় যা করেছে আল্লাহ্ তা তাঁর শাশ্বত জ্ঞানে জানতেন।

এখানে হযরত ইউসুফ (আ)-এর বক্তব্য যা সূরা ইউসুফ ১২, আয়াত ৩৮-এ বর্ণিত হয়েছে প্রণিধানযোগ্য ঃ আমি আমার পিতৃপুরুষ ইব্‌রাহীম, ইস্‌হাক ও ইয়া'কূবের মতবাদ অনুসরণ করি। আল্লাহ্‌র সঙ্গে কোন কিছু শরীক করা আমাদের কাজ নয়। এ হলো আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ আমাদের প্রতি এবং সমস্ত মানুষের প্রতি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

প্রথমে আল্লাহ তা'আলা আদম (আ)-এর পৃষ্ঠ থেকে তাঁর সন্তানদের পিঁপড়ার ন্যায় বের করেন এবং তাঁর ডানে ও বামে ছড়িয়ে দেন। তাদের জ্ঞান দান করেন যাতে তারা তাঁর কথা বুঝতে পারে ও উত্তর দিতে পারে। তারপর তিনি তাদের 'আমি কি তোমাদের রব নই' বলে সম্বোধন করেন। তিনি তাদের নির্দেশ দেন ঈমান ও ইহ্‌সানের এবং নিষেধ করেন কুফ্‌রী ও নাফরমানী থেকে। তারা সেদিন আল্লাহ্‌র কথার জবাব দিয়েছিল তাঁর রাবুবিয়্যাতের স্বীকৃতির দ্বারা। বলেছিল 'হ্যাঁ' তুমি আমাদের রব। তাদের এ স্বীকৃতিই প্রকৃত ঈমান। তারা যখন জন্মগ্রহণ করে তখন এ স্বীকৃতি নিয়েই জন্মগ্রহণ করে। এ কথাই কুরআনে বলা হয়েছে ঃ তুমি একনিষ্ঠ হয়ে নিজেকে দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহ্‌র সে প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে প্রকৃতিতে তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টিতে কোন পরিবর্তন নেই। (সূরা রূম ৩০, আয়াত ৩০) হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ প্রত্যেক মানব শিশু সহজাত প্রকৃতি নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। আর তা হলো ইসলাম। তার পিতা-মাতা তাকে ইহুদী বানায়, অথবা নাসারা বানায়, অথবা অগ্নি উপাসক বানায়।

যে জন্মের পর কুফরী করল, সে আল্লাহ্‌র কাছে দেয়া ঈমানের প্রতিশ্রুতির খেলাফ করল। আল্লাহ্‌র রাবুবিয়্যাতের স্বীকৃতির বিরোধিতা করল। আর যে ঈমান আনল, সে তো তার কর্মের মাধ্যমে, স্বীকৃতির মাধ্যমে ও প্রত্যয়ের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র কাছে দেয়া প্রতিশ্রুতি পালন করল। ইসলাম গ্রহণ করা এবং মৃত্যু পর্যন্ত দৃঢ়ভাবে ইসলামে কায়িম থাকা, আল্লাহ্‌র কাছে দেওয়া ওয়াদায় 'উবুদিয়্যাতের বাস্তব প্রমাণ।

আল্লাহ্ তা'আলা বান্দাকে সৃষ্টি করে তাকে শক্তি দিয়েছেন স্বেচ্ছায় আনুগত্য করার অথবা অবাধ্য হওয়ার। সে বাধ্য নয় তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ক্রিয়া সম্পাদন করতে। সূরা আ'রাফ ৭, আয়াত ১৭২-১৭৩-এ বর্ণিত হয়েছে ঃ "স্মরণ কর, তোমার রব বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরকে বের করেন এবং তাদের নিজেদের সম্বন্ধে স্বীকারোক্তি গ্রহণ করেন আর বলেন, আমি কি তোমাদের রব নই ? তারা বলে ঃ নিশ্চয়ই ; আমরা সাক্ষী রইলাম। এ স্বীকৃতি গ্রহণ এ জন্য যে, কিয়ামতের দিন তোমরা যেন না বল, 'আমরা তো ছিলাম এ বিষয়ে অনবহিত।' কিংবা তোমরা যেন না বল, "শিরক তো করেছে আমাদের পূর্ব পুরুষরা এর আগে, আর আমরা তো

তাদের পরবর্তী বংশধর ; তবে কি তুমি আমাদের হালাক করবে বিপথগামীদের কৃত কর্মের জন্য?" এ সম্পর্কে ইবন আব্বাস (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা আদম (আ)-এর পৃষ্ঠদেশ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেন। তাঁর সমস্ত সন্তানদের তাঁর পৃষ্ঠদেশ থেকে বের করেন এবং তাঁর সামনে ছড়িয়ে দেন। তাদের প্রত্যেককে অবয়ব দান করেন এবং তাদের কার্যকরী জ্ঞান ও বক্তব্য প্রকাশের রসনা দেন। তারপর তাদের সঙ্গে এমনিভাবে কথা বলেন যে, আদম (আ) তা প্রত্যক্ষ করেন। আল্লাহ্ বলেন ঃ "আমি কি তোমাদের রব নই ?" তারা বলেন ঃ "নিশ্চয়ই, আমরা সাক্ষী রইলাম।"

১১. ঈমান ও কুফরী বান্দার কাজ ; ঈমান আনতে কিংবা কুফ্রী করতে আল্লাহ্ কাউকে বাধ্য করেন না

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষের অন্তরে আনুগত্য অথবা অবাধ্যতা সৃষ্টি করেন না। বরং যখন বান্দার ইচ্ছা ও ক্রিয়ার সংযোগ হয় তখন তিনি তা তাদের অন্তরে পয়দা করেন। কোন কাজের জন্য কাউকে বাধ্য করা হলে, প্রকৃতপক্ষে কাজটি যে বাধ্য করল তার। যেমন কোন মু'মিনকে কুফরী কালাম উচ্চারণ করতে বাধ্য করা হলে, সে যদি তা করে এবং তার অন্তরে ঈমান দৃঢ় থাকে, তা হলে সে ঈমানদার, আর যে তাকে বাধ্য করল, কুফরী তার। কিন্তু একজন মুনাফিক বাহ্যত: ঈমানের কথা বলে, আসলে তার অন্তরে রয়েছে কুফর। এখানে স্বেচ্ছায় যা সে করল, সে নিফাকই তার। কাফির তার কুফরীর জন্য যেমন বাধ্য নয়, ঠিক মু'মিনও তার ঈমানের জন্য বাধ্য নয়। কাফির ইচ্ছা করেই কাফির হয়েছে। কুফরী তার কাছে কাম্য। আর মু'মিন ইচ্ছা করেই মু'মিন হয়েছে এবং ঈমান তাঁর কাছে প্রিয় ও কাঙ্খিত। একথাই সূরা রূম ৩০, আয়াত ৩২-এ বলা হয়েছে ঃ প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল।

আল্লাহ্ তা'আলা মানুষকে ব্যক্তি হিসাবে সৃষ্টি করেছেন। তাকে ঈমান অথবা কুফরী গ্রহণ করার বা বর্জন করার শক্তি দিয়েছেন। সে নিজ ইচ্ছায়, কোন বাধ্যবাধকতা ছাড়াই এর যে কোন একটি গ্রহণ করতে বা বর্জন করতে সক্ষম। যে কুফরী করে আল্লাহ্ তাকে কুফরী করা অবস্থায় কাফির হিসাবে জানেন। আবার যখন সে কুফরী পরিত্যাগ করে ঈমান আনে, তখন তাকে মু'মিন হিসাবে জানেন। তাঁর এ জানার তারতম্যে তাঁর শাশ্বত জ্ঞান ও সিফাতে কোন পরিবর্তন হয় না। যে পরিবর্তন হয় তা সৃষ্টিতে সময় ও স্থানের পরিবর্তনের কারণে। আল্লাহ্র ইল্ম তো শাশ্বত। তিনি শুধু এ পরিবর্তনই জানেন তা নয়, তিনি তো জানেন এর জন্য পরিণতি কি হবে। এর হিসাব, নিকাশ, আযাব, সওয়াব ইত্যাদি সবকিছু তিনি জানেন।

১২. বান্দার কাজ তার উপার্জন এবং আল্লাহ্‌র সৃষ্টি

প্রকৃতপক্ষে বান্দা যে সব কাজ করে, যেমন ঈমান আনা, কুফরী করা, আনুগত্য করা, অবাধ্য হওয়া, বসে থাকা, ঘুমিয়ে পড়া, উঠে দাঁড়ান, কথা বলা, ইত্যাদি সবই তার নিজস্ব উপার্জন, আর এ সবের স্রষ্টা মহান আল্লাহ্ তা'আলা। বান্দা তার নিজের ইচ্ছায় বাইরের কোন প্রভাব ছাড়াই যা চায় তাই করে। এ তার 'কসব' বা উপার্জন। আর এ ক্ষেত্রে আল্লাহ্ খালিক বা স্রষ্টা। 'কসব' এমন ব্যাপার, যার কর্তা আলাদাভাবে কোন উপকরণ ছাড়া তা সংঘটিত করতে পারে না। খাল্‌ক বা সৃষ্টি এমন ব্যাপার, যার কর্তা নিজেই কোন উপকরণ ছাড়া তা সংঘটিত করেন। যা বান্দার ইচ্ছা ছাড়া সংঘটিত হয় তা তার কসব নয়, কিন্তু তা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি। যেমন ভীত-সন্ত্রস্ত ব্যক্তির কাঁপুনি। ক্রিয়া থেকে উৎপন্ন আনুষঙ্গিক, যেমন প্রহারের বেদনা, বান্দার কসব নয়, আল্লাহ্‌র খাল্‌ক বা সৃষ্টি। সূরা সাফ্‌ফাত ৩৭, আয়াত ৯৫-৯৬-এ বলা হয়েছে ঃ তোমরা কি ইবাদত কর তাদের, যাদের তোমরা খোদাই করে নির্মাণ করো ? অথচ আল্লাহ্ই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের এবং যা কিছু তোমরা তৈরি কর তাও। এখানে বলা হয়েছে যে, আল্লাহ মানুষের স্রষ্টা এবং তার কাজেরও স্রষ্টা, তাই ইবাদত তো তাঁরই করতে হয়। যে সৃষ্ট, যে সৃষ্টি করতে পারে না, তার ইবাদত করা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। আল কুরআনে বারবার বর্ণিত হয়েছে ঃ আল্লাহ্ সবকিছুর স্রষ্টা। আল্লাহ অমুখাপেক্ষী আর তোমরা সবাই মুখাপেক্ষী। আর প্রশ্ন রাখা হয়েছে : যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি কি তার সমান, যে সৃষ্টি করতে পারে না ?

ইমাম আ'যম তাঁর 'আল অসিয়াত' গ্রন্থে বলেছেন ঃ আমরা স্বীকার করি যে, বান্দা তার যাবতীয় ক্রিয়াকর্ম বিশ্বাস, স্বীকৃতি ও পরিচিতি সহ সৃষ্ট। যখন কর্তা সৃষ্ট তখন তার ক্রিয়াকর্ম অবশ্যই সৃষ্ট।

বান্দার সব কাজ, তা ভাল হোক অথবা মন্দ হোক, আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় তাঁর জ্ঞানে, তাঁর ফায়সালায় ও তাঁর নির্ধারণ অনুযায়ী সংঘটিত হয়। এবং যাবতীয় ইবাদত, তা ওয়াজিব হোক কিংবা নফল, কম হোক অথবা বেশি, আল্লাহ্‌র আদেশ অনুযায়ী কায়িম হয়। যেমন আল্লাহ বলেছেন ঃ আনুগত্য কর আল্লাহ্‌র এবং আনুগত্য কর রাসূলের। ইবাদত তাঁর মহব্বত ও ভালবাসার জন্য সংঘটিত হওয়ার অর্থ আল্লাহ্ চান তাই বান্দা করে। যেমন তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ্ মুত্তাকীদের ভাল বাসেন ; আল্লাহ সৎকর্মপরায়ণ লোকদের ভালবাসেন ; আল্লাহ্ পবিত্রতা অবলম্বনকারীদের ভালবাসেন; ইত্যাদি। মু'মিনদের সম্বন্ধে আল্লাহ্ বলেছেন ঃ আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাঁরাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট ; তাঁরা আল্লাহ্‌র দল। জেনে রেখো, আল্লাহ্‌র দলই কামিয়াব হবে।

বান্দার যাবতীয় পাপ কাজ, তা ছোট হোক কিংবা বড় হোক, সংঘটিত হয় আল্লাহ্র জ্ঞান, ফয়সালা, নির্ধারণ ও ইচ্ছা অনুযায়ী, তবে তাঁর ভালবাসায় ও সন্তুষ্টিতে নয়। এসব কাজ তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী হয় না। আল্লাহ্ ইরাদা না করলে এর কোনটিই হতে পারে না। কেননা তিনি সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। বান্দা চায় তাই আল্লাহ্ ঘটান। এখানেই বান্দার ইখতিয়ার। যার জন্য তাকে পুরস্কৃত করা হয় ও শাস্তি দেওয়া হয়। তবে আল্লাহ্ এসব পাপ কাজ পছন্দ করেন না। যেমন আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ আল্লাহ্ কাফিরদের ভালবাসেন না ; আল্লাহ্ যালিমদের ভালবাসেন না। আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের জন্য কুফরী পছন্দ করেন না। (৩৯ ঃ ৭)। শয়তান অশ্লীলতা, অন্যায় কাজ ও সীমালঙ্ঘনের প্ররোচনা দেয় আর আল্লাহ্ এসব থেকে নিষেধ করেন। তিনি নির্দেশ দেন ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দান করার। নিষেধ হলো নির্দেশের বিপরীত। তাই কুফরী থেকে যখন আল্লাহ্ নিষেধ করেছেন, তখন তা তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী সংঘটিত হয়, একথা অকল্পনীয়। যা কিছু বিদ্যমান তা সবই আল্লাহ্র সৃষ্টি। এর মধ্যে বান্দা যে আমল করে তাও আল্লাহ্র সৃষ্টি। তবে এসবের কতকের সঙ্গে তাঁর সন্তুষ্টি ও ভালবাসার সম্পর্ক রয়েছে। আর কতকের সঙ্গে তাঁর ক্রোধ ও বিরাগ রয়েছে। আল্লাহ্ সবকিছুরই স্রষ্টা। তবে ভব্যতা ও শিষ্টতার দরুণ এরূপ বলা ঠিক নয় যে, আল্লাহ্ কুফর ও নিফাক, যুলম ও ফিসকের স্রষ্টা এবং ইচ্ছা করে এসব সৃষ্টি করেছেন। বরং বান্দা যখন তার নিজ ইচ্ছায় করতে চেয়েছে তখন তিনি তার মধ্যে করার ক্ষমতা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। 'আল অসিয়াত' গ্রন্থে ইমাম আ'যম বলেছেন যে, বান্দার কাজ তিন প্রকার ঃ ফরিযা, ফযিলা ও মা'সিয়া। ফরিযার মধ্যে ফরয ও ওয়াজিব শামিল। ফরয এমন কাজ, যার জন্য ই'তিকাদ ও আ'মল প্রয়োজন। ওয়াজিব এমন কাজ, যার জন্য আ'মল প্রয়োজন। ফযিলার মধ্যে সুন্নাত, মুস্তাহাব ও নফল শামিল। মা'সিয়াতের মধ্যে হারাম ও মাকরূহ শামিল। ফরিযা আল্লাহ্র নির্দেশে, তাঁর ইচ্ছায়, তাঁর মহব্বতে, তাঁর সন্তুষ্টিতে, তাঁর ফয়সালায়, তাঁর নির্ধারণে, তাঁর ইরাদায়, তাঁর তওফীকে সৃষ্ট। ফযিলা আমল আল্লাহ্র নির্দেশ নয়। তবে তাঁর ইচ্ছায়, তাঁর সন্তুষ্টিতে, তাঁর ফয়সালায়, তাঁর নির্ধারণে ও তাঁর তওফীকে সৃষ্ট। আর মা'সিয়াত তাঁর নির্দেশ নয়। তবে তাঁর ইচ্ছায় কিন্তু তাঁর মহব্বতে নয় ; তাঁর ফয়সালায় কিন্তু তাঁর সন্তুষ্টিতে নয় ; তাঁর নির্ধারণে কিন্তু তাঁর তওফীকে নয় বরং তাঁর অসন্তুষ্টি ও বিরাগে।

১৩. নবী-রাসূলরা ছোট-বড় পাপ থেকে পবিত্র

আল্লাহ্ তা'আলা বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন এলাকায় মানুষকে তাঁর হিদায়াত পৌঁছে দেয়ার জন্য এক লাখ চব্বিশ হাজার মতান্তরে দু'লাখ চব্বিশ হাজার নবী ও রাসূল প্রেরণ করেন। এদের প্রথম ছিলেন আদম (আ) এবং সর্বশেষ ছিলেন মুহাম্মাদুর

রাসূলুল্লাহ্ (সা)। এরা সকলেই যাবতীয় ছোট-বড় গুনাহ থেকে পাক-পবিত্র ছিলেন। তাঁরা শিরক, কুফর ও অশ্লীল কাজ যেমন হত্যা, ব্যভিচার, চুরি, সতী নারীর প্রতি অপবাদ, যাদু, পরনিন্দা, সূদ ও ইয়াতীমের মাল ভক্ষণ, পৃথিবীতে ফাসাদ সৃষ্টি করা ইত্যাদি থেকে মুক্ত ও পবিত্র ছিলেন। ছগীরা ও কবীরা গুনাহের সংখ্যা সম্পর্কে মতভেদ পরিলক্ষিত হয়। ইবন আব্বাস (রা) বলেন যে, কবীরা গুনাহ সাত শতের মত। তবে তওবা ইস্তিগফার করলে কোন কবীরা গুনাহই কবীরা থাকে না। আবার কোন ছগীরা গুনাহ ছগীরা থাকে না যখন তা বারবার করা হয়। ইবন সীরীন (র)-এর মতে যেসব কাজ করতে আল্লাহ্ তা'আলা নিষেধ করেছেন তা সবই কবীরা। সূরা নিসা ৪, আয়াত ৩১-এ বর্ণিত হয়েছে ঃ তোমরা যদি বিরত থাক কবীরাহ্ গুনাহ থেকে, যা থেকে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তা হলে তোমাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি সমূহ বিদূরিত করা হবে তোমাদের দাখিল করব বিহিশতের সম্মানজনক স্থানে। হাসান বসরী (র), সা'য়ীদ ইবন জুবাইর (রা), যোহাক (রা) ও অন্যান্যদের মতে, আল-কুরআনে যে পাপের বর্ণনার সাথে ভীতি ও শাস্তির কথা উল্লেখিত হয়েছে তা কবীরা। তাছাড়া ফরয ও ওয়াজিব পরিত্যাগ করা এবং হারাম কাজ করা কবীরা। ছগীরা ও কবীরা তুলনামূলক বিষয়। কারো জন্য একটি কাজ ছগীরা হিসাবে বিবেচিত হতে পারে, অথচ সে কাজটি অন্য একজনের জন্য কবীরা হতে পারে। যেমন বলা হয়-নেক লোকদের ভাল কাজ আল্লাহ্‌র নৈকট্য লাভকারীদের জন্য ছোট গুনাহ। (حسنات الابرار سيات المقربين)

নবীদের পবিত্র ও পাপমুক্ত হওয়ার মানে এ নয় যে, তাঁরা মানবীয় স্বভাবজাত ত্রুটি-বিচ্যুতি থেকেও মুক্ত। নুবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে অথবা পরে তাঁদের থেকে ছোট খাট ভুল-ভ্রান্তি, ত্রুটি-বিচ্যুতি হওয়া স্বাভাবিক। যেমন আদম (আ)-এর নিষিদ্ধ গাছের ফল খাওয়ার ব্যাপার। এখানে তাঁর নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল ভক্ষণ করার পেছনে হিকমতে ইলাহী কাজ করেছে। তাই তিনি এরূপ করেছিলেন।

১৪. মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর নবুওওয়াত

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে তাঁর বংশতালিকা এভাবে বর্ণনা করেছেন ঃ মুহাম্মদ ইবন আবদুল্লাহ ইবন আবদুল মুত্তালিব ইবন হাশিম ইবন আবদ মান্নাফ ইবন কুসাই ইবন কিলাব ইবন মুররা ইবন কা'ব ইবন লুই ইবন গালিব ইবন ফাহর ইবন মালিক ইবন নযর ইবন কিনানা ইবন খুযাইমা ইবন মুদরিকা ইবন ইল্‌ইয়াস ইবন মুযীর ইবন নাযার ইবন সা'দ ইবন আদনান। তিনি ছিলেন আল্লাহ্‌র নবী, তাঁর বন্ধু, তাঁর বান্দা, তাঁর রাসূল, তাঁর মনোনীত পছন্দিদা ব্যক্তি। নুবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে বা পরে কখনো তিনি মূর্তিপূজা করেননি। আল্লাহ্‌র সঙ্গে এক মুহূর্তের

জন্যও শরীক করেননি। যদিও মানুষ হিসেবে ছগীরা ত্রুটি-বিচ্যুতি নবীদের থেকে সংঘটিত হওয়া স্বাভাবিক, তবুও তিনি কখনো কোন ছগীরা বা কবীরা গুনাহ করেননি। সূরা তওবা ৯, আয়াত ৪৩-এ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করেছেন। এখানে ৯ম হিজরীতে তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে অব্যাহতি লাভের জন্য মুনাফিকরা ওযর পেশ করলে, রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাদের অব্যাহতি দিলে আল্লাহ্ তা'আলা এ আয়াত নাযিল করেন। সেখানে আরো বলা হয় ঃ কেন আপনি ওদের ওযর কবূল করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে অব্যাহতি দিলেন অথচ আপনার কাছে স্পষ্ট হয়নি কারা সত্যবাদী ও কারা মিথ্যাবাদী। এ আয়াত রাসূলের শানে উত্তম পন্থা পরিহার করার কারণে সতর্ক করার জন্য নাযিল করা হয়। তিনি মুনাফিকদের ওযর কবূল না করে তাদের শাস্তি দিতে পারতেন। তা তিনি না করে তাদের ওযর কবূল করে যুদ্ধে অংশগ্রহণ থেকে অব্যাহতি দিলেন। একাজ কোন পাপের কাজ নয়। তাই একথা বলা ঠিক নয় যে, আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্‌র পাপ ক্ষমা করেছেন। বরং দুটি বিকল্প ব্যবস্থার মধ্যে একটি গ্রহণ করায় যেটি উত্তম ব্যবস্থা সে দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ ছিলেন ইনসানে কামিল। সূরা ইসরা ১৭ ঃ আয়াত ১-এ আল্লাহ্ তা'আলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শানে 'আবদ' শব্দ ব্যবহার করেছেন ঃ পবিত্র মহিমাময় তিনি, যিনি রাতে ভ্রমণ করালেন তাঁর বান্দাকে মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসায়। তিনি ছিলেন নবী, তিনি ছিলেন রাসূল। নবী ও রাসূলের মধ্যে পার্থক্য—নবী বিশেষ অর্থে এবং রাসূল ব্যাপক অর্থে। নবী তাবলীগের জন্য আদিষ্ট হতে পারেন, নাও হতে পারেন। রাসূল তাবলীগের জন্য আদিষ্ট। তাই সকল রাসূলই নবী। কিন্তু সব নবী রাসূল নন। কারো কারো মতে নবী ও রাসূল সমার্থক। আবার কেউ বলেন, নবী ও রাসূল বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত। মোট কথা নবী ও রাসূল এর সকল গুণই মুহাম্মদ (সা)-এর মধ্যে ছিল। তাই তাঁকে আল-কুরআনে নবী ও রাসূল উভয় সম্বোধনেই ভূষিত করা হয়েছে। যেমন মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্ এবং খাতামুন্নবীয়ীন ইত্যাদি।

চল্লিশ বছর বয়সে মুহাম্মদ (সা) রিসালাত প্রাপ্ত হন। এর পূর্বে তিনি কোন নবীর উম্মত ছিলেন না। তিনি নুবুওয়াতের স্তরে সমাসীন ছিলেন। যা কিছু সত্য ও হক তিনি তা-ই করতেন। এ কারণে তাঁর চল্লিশ উত্তর কালকে নুবুওয়াতের কালে সীমাবদ্ধ না করে বরং চল্লিশপূর্ব জন্মদিন থেকেই তাঁকে অনেকে নুবুওয়াতের সিফাতে বিশেষিত করেন। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে এ সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে যে, মি'রাজের সময় আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ সৃষ্টির দিক দিয়ে আমি আপনাকে নবীদের প্রথম এবং দুনিয়ায় প্রেরণের দিক দিয়ে সর্বশেষ করেছি। অন্য এক হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ যখন আদম আত্মা ও দেহের মধ্যবর্তী অবস্থায় ছিলেন তখন আমি নবী ছিলাম।

তাঁর নুবুওয়াতের দলীল তিনি নিজেই। যারা নবুওয়াতের মিথ্যা দাবী করেছে তাঁদের চরিত্রই প্রমাণ করেছে যে, তারা মিথ্যাবাদী, তারা অজ্ঞ। তিনি ছিলেন নিস্কলুষ, নির্মল, পবিত্র ও অমলিন চরিত্রের অধিকারী। আল-কুরআন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রচিত নিজের কথা, এ ধারণা মক্কার মুশরিকদের ছিল। এর উত্তরে সূরা ইউনুস ১০, আয়াত ১৬-তে বলা হয়েছে ঃ আমি তো তোমাদের মাঝে এর পূর্বে দীর্ঘকাল কাটিয়েছি, তবুও কি তোমরা বুঝতে পার না ?

মুশরিকদের সামনে নিজের জীবনের বিগত দিনগুলো তাঁর চরিত্রের সনদ হিসাবে পেশ করলে, তারা কোন উত্তর দিতে পারে নি। কেননা তাঁর জীবন ছিল পূত-পবিত্র। তিনি ছিলেন তাদের পরম প্রিয় আল-আমীন, বিশ্বস্ত।

১৫. নবীদের পর শ্রেষ্ঠ মানুষ খুলাফায়ে রাশেদূন

নবীদের সম্পর্কে অধিকাংশের মত যে, চারজন নবী জীবিত আছেন। তাঁদের মধ্যে খিজির (আ) ও ইলিয়াস (আ) পৃথিবীতে এবং ঈসা (আ) ও ইদ্রীস (আ) আসমানে আছেন। মর্যাদার দিক দিয়ে নবী-রাসূলদের পর ফিরিশতাদের স্থান। মানুষের মাঝে নবীদের ও রাসূলদের পর খুলাফায়ে রাশেদূনের স্থান। কারো কারো মতে তাঁরা সকলেই মর্যাদায় সমান। আবার কারো কারো মতে তাঁদের মর্যাদা খিলাফতের ক্রমধারায়।

আবূবকর সিদ্দীক (রা) ঃ জাহিলী আমলে তাঁর নাম ছিল আবদুল কা'বা। ইসলাম গ্রহণের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর নাম রাখেন আবদুল্লাহ্। তাঁর পিতার নাম আবু কুহাফা উসমান ইবন আমির ইবন কা'ব ইবন তায়ম ইবন মুররা। তিনি ষষ্ঠ পুরুষে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে মিলিত হন। তিনি একজন কুরায়শ।

তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায় সালাতে তাঁর প্রতিনিধিত্ব করেন। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক, সত্যানুরাগ, ইসলাম গ্রহণে অনতিক্রম্য প্রাধান্য, রিসালাতের পদের সমাপ্তির পর খিলাফতের প্রথম দায়িত্ব পালন ইত্যাদি দিক দিয়ে আবূ বকর সিদ্দীক (র) এর মর্যাদা অনন্য।

উমর ইবন আল খাত্তাব (রা) ঃ অষ্টম পুরুষে তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে মিলিত হন। তাঁর বংশ তালিকা—উমর ইবন খাত্তাব ইবন নুফাইল ইবন আবদুল উজ্জা ইবন রিবাহ ইবন আবদুল্লাহ ইবন কুরাত ইবন দারাহ ইবন আদী ইবন কা'ব আল কারাশী আল আদাভী। তিনি হক ও বাতিলের মধ্যে আপোষহীন পার্থক্যকারী ছিলেন বিধায় তাঁকে আল-ফারূক--পার্থক্যকারী উপাধীতে ভূষিত করা হয়। সূরা নিসা ৪, আয়াত ৬০-এ উমর (রা)-এর রায়ের অনুকূলে আল্লাহ্র ফয়সালা নাযিল হলে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ হক তো উমরের জবানে জারি হয়। তাঁর খিলাফতের শপথ,

ফযিলত, উসমানের জন্য খিলাফতের শপথ, শাহাদাত ইত্যাদি সহীহ্ বুখারীতে বিশদভাবে বর্ণিত আছে।

উসমান ইবন আফ্ফান (রা) ঃ তিনি ছিলেন কুরাইশ বংশের উমাইয়্যা শাখার। তাঁর বংশ তালিক—উসমান ইবন আফ্ফান ইবন আল-আস ইবন উমাইয়্যা ইবন আবদ শামস ইবন আবদ মান্নাফ ইবন কুসাই। পঞ্চম পুরুষে রাসূলুল্লাহ্‌র সঙ্গে তিনি মিলিত হন। তাঁকে যুন্নুরাইন-দুটি নূরের মালিক খিতাবে ভূষিত করা হয়েছে। কারণ তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর দু' কন্যা-রুকাইয়া ও উম্মু কুলসুমকে শাদী করেছিলেন। উসমান (রা) ছাড়া আর কেউ কোন নবীর দু'কন্যাকে কখনো শাদী করেননি। এ ছিল তাঁর জন্য অনন্য বৈশিষ্ট্য। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ আমার আরো কন্যা থাকলে উসমানের সঙ্গে শাদী দিতাম।

আলী ইবন আবু তালিব (রা) ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা আবূ তালিবের পুত্র এবং তাঁর কন্যা ফাতিমা যোহরা (রা)-এর স্বামী, হাসান (রা) ও হুসাইন (রা)-এর পিতা। তাঁকে রাসূলুল্লাহ্ (সা) 'জ্ঞানের নগরী' বলেছেন এবং মুসলিমদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বিচারক আখ্যা দিয়েছেন।

এদের সম্পর্কে সূরা তওবা ৯, আয়াত ১০০-তে বর্ণিত হয়েছে ঃ মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম অগ্রগামী আর যারা নিষ্ঠার সঙ্গে তাঁদের অনুসরণ করে আল্লাহ্ তাঁদের প্রতি প্রসন্ন এবং তাঁরাও তাতে সন্তুষ্ট এবং আল্লাহ্ তাঁদের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাত, প্রবাহিত হয় যার পাদদেশে নহরসমূহ, সেথায় তাঁরা স্থায়ী হবে। এ হলো মহা সাফল্য।

খুলাফায়ে রাশেদূন সম্পর্কে উম্মতের ইজমা যে, তাঁরা মুহাজিরদের মধ্যে সাবিকূন-প্রথম অগ্রগামী ছিলেন। তাঁরা উক্ত আয়াতের মর্মানুযায়ী নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌র সন্তোষভাজন। তাঁদের প্রতি আল্লাহ্‌র প্রসন্নতা বিরাজমান। তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সময় যেরূপ সত্যের ওপর কায়িম ছিলেন, মৃত্যু পর্যন্ত সে অবস্থায় ছিলেন। তাঁদের মধ্যে তাকওয়া ও ঈমানদারীর কোন পরিবর্তন হয়নি। যারা মনে করে যে, প্রথম তিনজন খলীফা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জমানার পর বদলে গেছেন, তাই তাঁদের মর্যাদা প্রশ্নাতীত নয়, তাদের এ ধারণা অলীক, বাতিল। আর যারা মনে করে যে, আলী (রা), মুআবিয়া (রা), আমর ইবন আল আস (রা) ও তাঁদের অগ্রগামীরা কাফির ও তাঁদের হত্যা করা ওয়াজিব, তাদের এ ধরনের ধারণা উদ্ভট ও ভ্রান্ত।

খুলাফায়ে রাশেদূন সম্পর্কে আল-কুরআনে অনেক আয়াত নাযিল হয়েছে। সূরা তওবা ৯, আয়াত ৪০-এ বর্ণিত হয়েছে ঃ যদি তোমরা তাঁকে সাহায্য না কর তবে মনে রেখ, আল্লাহ্ তাঁকে সাহায্য করেছিলেন যখন কাফিররা তাঁকে বহিষ্কার করেছিল এবং তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তাঁরা উভয় গুহার মধ্যে ছিল। তিনি তখন

তাঁর সঙ্গীকে বলেছিলেন ঃ বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ্ আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। তারপর আল্লাহ্ তাঁর ওপর তাঁর প্রশান্তি বর্ষণ করেন এবং তাঁকে শক্তিশালী করেন এমন এক সেনাবাহিনী দিয়ে, যাদের তোমরা দেখনি।

এ আয়াতে উল্লেখিত গুহাসঙ্গী বলতে আবূবকর সিদ্দীক (রা)-কেই বোঝানো হয়েছে। সূরা লায়ল ৯২, আয়াত ৪-৭, ১৮-২১-এ হযরত আবূবকর সিদ্দীক (রা)-এর শানে ; সূরা আলে ইমরান ৩, আয়াত ১৫৯-এ হযরত আবূ বকর ও হযরত উমর (রা)-এর শানে ; সূরা আল-হিজর ১৫, আয়াত ৪৭-এ হযরত আবূ বকর, হযরত উমর ও হযরত আলী (রা)-এর শানে ; এ ধরনের অনেক আয়াত আল-কুরআনে খুলাফায়ে রাশেদূনের শানে নাযিল হয়েছে। হাদীসে তাঁদের সম্পর্কে অনেক ফযীলতের বর্ণনা রয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) তাঁর সাহাবীদের খারাপ নামে ডাকতে ও গালি দিতে নিষেধ করেছেন। তাই আমরা তাঁদের মর্যাদার সাথে স্মরণ করি। তাঁদের সম্পর্কে কোন প্রকার খারাপ ধারণা পোষণ করি না। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গীদের সবার সম্বন্ধে আমরা ভাল ধারণা রাখি। তাঁদের কারো থেকে মানুষ হিসাবে কোন ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে যেতে পারে, এমন কোন কাজ সংঘটিত হতে পারে যা দৃশ্যত: ঠিক নয়, এমনটি ঘটলে তা ইজতিহাদের কারণে ঘটতে পারে অথবা পরে সংঘটিত ব্যাপারে তওবা করে তা থেকে ফিরে এসে থাকতে পারেন। তাঁরা কখনোই ফাসাদ সৃষ্টির জন্য, বৈরিতার জন্য কোন কাজ করেন নি। ইমাম আহমদ ইবন হাম্বল (র)-কে হযরত আলী ও হযরত আয়েশা (রা)-এর মধ্যকার ঘটনা সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেছিলেন ঃ তাঁরাতো অতীত লোক, তাদের জন্য তা যা তাঁরা অর্জন করেছে, আর তোমরা যা অর্জন কর তা তোমাদের। তারা যা করত সে সম্বন্ধে তোমাদের প্রশ্ন করা হবে না। (সূরা আল-বাকারাহ ২, আয়াত ১৩৪, ১৪১) ইমাম আবূ হানীফা (র) বলেন ঃ হযরত আলী (রা) না হলে আমরা খারিজীদের চরিত্র সম্পর্কে অবহিত হতে পারতাম না।

সাহাবায়ে কিরাম সম্পর্কে মুসলিমদের আকীদা হলো, তাঁরা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গী ছিলেন, তাঁরা ইসলাম কায়িমে তাঁকে সাহায্য করেছেন, কষ্ট করেছেন, তাঁরা মানুষ হিসাবে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গী হওয়ার দরুণ পরবর্তী সকল মানুষের চাইতে উত্তম, তাঁদের জন্য সকল মু'মিনের রয়েছে ভালবাসা ও গভীর শ্রদ্ধাবোধ। তাঁদের সম্পর্কে কোন অশোভন উক্তি মু'মিনরা বরদাশ্‌ত করে না।

১৬. কবীরা গুনাহ মু'মিনকে ঈমান থেকে খারিজ করে না

যদি কোন মুসলিম ছগীরা কিংবা কবীরা গুনাহ্ করে ফেলে তাহলে তাকে এ কারণে কাফির বলা যাবে না। যেমন খারিজীরা বিশ্বাস করে যে, কেউ কবীরা গুনাহ করলে সে কাফির হয়ে যায়। তবে যদি কেউ শরীয়তের অকাট্য দলীল দিয়ে প্রমাণিত

গুনাহকে বৈধ মনে করে তাহলে সে কাফির। মু'তাযিলারা মনে করে যে, কেউ কবীরা গুনাহ্ করলে সে মু'মিনও নয় আবার কাফিরও নয়। এ দু'য়ের মাঝামাঝি অবস্থায় তার স্থান। আহলুস সুন্নাহ-এর মতে সে মু'মিন। কেননা ঈমান হলো অন্তরের প্রত্যয় এবং জবানের স্বীকৃতি। তবে বাস্তবে তা রূপায়িত করা ঈমানের শর্ত নয়। খারিজী ও মু'তাযিলীদের মতে তা ঈমানের শর্ত ও অঙ্গ। আহলে সুন্নাহ্ ওয়াল জামাআতের মতে একজন তার অন্তরের প্রত্যয় ও জবানের স্বীকৃতির দরুণ মু'মিন আর তার আমলের কারণে ফাসিক হতে পারে। কিন্তু তাকে কাফির বলা যাবে না।

১৭. মোজার উপর মসেহ, তারাবীর নামায, সালাত ও সওমের রুখছত, ঈমানদার বদকারের পেছনে নামায আদায় করা

ইমাম আ'যম (র) বলেন ঃ মোজার ওপর মসেহ করা জায়িয, মুকীমের জন্য একদিন ও একরাত, আর মুসাফিরের জন্য তিন দিন ও তিন রাত। হাদীসে মুতাওয়াতির দ্বারা একথা প্রতিষ্ঠিত। সফরের সময় কিংবা ভয়ের সময় চার রাক'আত নামায দু' রাকা'আত কসর রূপে আদায় করা এবং অসুস্থ অবস্থায় কিংবা সফরের সময় রোযা না রেখে পরে ক্বাযা আদায় করার যে অনুমতি রয়েছে, তা কুরআনের আয়াত দ্বারা প্রতিষ্ঠিত। নামায কসরের নির্দেশ সূরা ৪, নিসার ১০১ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ যখন তোমরা দেশ-বিদেশে সফর করবে তখন তোমাদের কোন দোষ নেই নামায সংক্ষিপ্ত (কসর) করলে, যদি তোমরা ভয় কর যে, কাফিররা তোমাদের জন্য ফিৎনা সৃষ্টি করবে, কাফিররা তো তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন। এখানে যে কসরের অনুমতি দেয়া হয়েছে তা অবশ্য করণীয়। কেননা রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ এ হলো ছদকা, আল্লাহ্ তা'আলা তোমাদের এ ছদকা দান করেছেন। তাই তোমরা তাঁর ছদকা কবুল করো। এজন্য যদি কোন মুসাফির চার রাকা'আত আদায় করে তবে সে গুনাহগার হবে। কিন্তু সফরে ইফ্‌তারের যে হুকুম সূরা ২, আল বাকারার ১৮৪ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে তা ইফতারের বৈধতা বর্ণনার জন্য, অবশ্য পালনীয় অর্থে নয়। কেউ সফরে রোযা রাখলে রোযা আদায় হয়ে যাবে, তাকে ক্বাযা করতে হবে না, আর সে এজন্য গুনাহগারও হবে না। রমযান মাসের তারাবীর নামাযও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর আমল দ্বারা সুন্নাতে রাসূল হিসাবে প্রতিষ্ঠিত। উম্মতের ওপর দয়া পরবশ হয়ে তিনি এক সময় এ নামায এজন্য তরক করেছিলেন, যাতে পাছে তারা তারাবীর নামায ওয়াজিব বলে মনে করে না বসে। হযরত আবূ বকর (রা) ও উমর (রা) তাঁদের যামানায় নিয়মিত এ নামায আদায় করতেন।

একজন ইমাম যিনি মু'মিন, হোক নেককার কিংবা বদকার, তার পেছনে নামায আদায় করা জায়িয। অধিকাংশ ইমামদের মতে বদকার ইমামের পেছনে জুমআর

নামায কিংবা জামাতের নামায তরক করা বিদ্‌আত। ইবন মাসউদ (রা) অলীদ ইবন উকবা ইবন আবী মুইতের মত লোকের পেছনেও জামাতে নামায আদায় করেছেন। এ ব্যাপারে ইমাম আ'যম (র)-কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেছিলেন ঃ তোমরা শায়খাইন-আবূ বকর (রা) ও উমর (রা)-কে শ্রেষ্ঠত্ব দিবে, দু' জামাতাকে-উসমান (রা) ও আলী (রা)–কে ভালবাসবে, মোজার ওপর মসেহ করাকে বৈধ মনে করবে এবং নেককার কিংবা বদকার মু'মিন ইমামের পেছনে নামায আদায় করবে। তিনি তাঁর 'আল অসিয়াত' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ আমরা বিশ্বাস করি যে, এ উম্মতের শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব হচ্ছেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা) এর পর হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা), তাঁরপর হযরত উমর (রা), তাঁর পর হযরত উসমান (রা) এবং তাঁরপর হযরত আলী (রা)। এদের মধ্যে যিনি খিলাফতের দিক দিয়ে অগ্রগামী, তিনি শ্রেষ্ঠত্বের দিক দিয়েও অগ্রগামী। প্রত্যেক মুত্তাকী মু'মিন তাঁদের ভালবাসেন আর যারা তাঁদের সম্বন্ধে বিদ্বেষ পোষণ করে তারা তো বদবখ্‌ত মুনাফিক।

১৮. ঈমানদার গুনাহ্‌গার তার গুনাহের কারণে ক্ষতিগ্রস্ত হয়

ইমাম আ'যম বলেন ঃ কোন মু'মিন পাপ কাজ করলে সে ক্ষতিগ্রস্ত হবে না এমন নয়, অথবা এমনও নয় যে, কোন পাপী মু'মিন দোযখে প্রবেশ করবে না, এমনও নয় যে, সে চিরকাল সেখানে শাস্তি ভোগ করতে থাকবে। কোন মু'মিন যদি এ দুনিয়ায় কবীরা গুনাহ্ করে ফেলে কিন্তু সে দুনিয়া থেকে মু'মিন হিসাবে বিদায় নেয়, তা হলে সে-ও চিরকাল জাহান্নামে শাস্তি ভোগ করবে না। সূরা নিসা ৪, আয়াত ৪৮-এ বর্ণিত হয়েছে ঃ নিশ্চয় আল্লাহ্ ক্ষমা করেন না তাঁর শরীক করার অপরাধ। তিনি এছাড়া অন্যান্য অপরাধ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন ; আর যে কেউ আল্লাহ্‌র শরীক করে সে তো মহাপাপ করে।

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা শিরক ছাড়া অন্যসব গুনাহ্ তওবা না করলেও ক্ষমা করার কথা বলেছেন। বান্দা তওবা করলে শিরকও দূর হয়ে যায় এবং আল্লাহ্ তার সে তওবা কবূল করেন। আল-কুরআনে বারবার বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ তো তিনি, যিনি তাঁর বান্দাদের তওবা কবূল করেন। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ যে গুনাহ্ থেকে তওবা করল, সে যেন গুনাহ্ করেই নি।

মু'তাযিলারা মনে করে, পাপীকে শাস্তি প্রদান করা এবং নেককারকে পুরস্কৃত করা আল্লাহ্‌র অবশ্য করণীয় কর্তব্য। মুরজিয়ারা মনে করে, বান্দার ভাল কাজ আল্লাহ্‌র কাছে গৃহীত ও মন্দ কাজ ক্ষমাকৃত। এর কোনটিই ঠিক নয়। তবে সঠিক আকীদা হলো, এ-ই যে, কোন ব্যক্তি কোন ভাল কাজ করলে আল্লাহ্ তা'আলা সে কাজ বিনষ্ট করেন না; বরং তাকে সেজন্য প্রতিদান দেন। তবে সে কাজ সবধরনের ত্রুটিমুক্ত হতে হবে এবং কুফরী, শিরক ও দীন বিরোধীতা থেকে বিশুদ্ধ হতে হবে। আর তাকে

দুনিয়া থেকে মু'মিন হিসাবে বিদায় নির্তে হবে। কেননা ঈমানের ওপর আখিরাতের আযাব ও ছাওয়াব নির্ভর করে। একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, ঈমান থাকলেও প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে আমল ক্ষতিগ্রস্ত হয়। যেমন লোক দেখানোর জন্য কাজ করা, অহঙ্কার ও আত্মগরিমার জন্য কাজ করা, হিংসা-বিদ্বেষের বশবর্তী হয়ে কাজ করা ইত্যাদি। সূরা বাকারা ২, আয়াত ২৬৪-তে বর্ণিত হয়েছে ঃ ওহে, যারা ঈমান এনেছ, তোমরা নিষ্ফল করো না তোমাদের দানকে ; দানের কথা প্রচার করে এবং ক্লেশ দিয়ে ঐ ব্যক্তির ন্যায়, যে নিজের ধন লোক দেখানোর জন্য ব্যয় করে থাকে এবং ঈমান রাখে না আল্লাহ্ ও আখিরাতে। সূরা মায়িদা ৫, আয়াত ৫-এ বর্ণিত হয়েছে ঃ যে কুফরী করে ঈমানের সাথে তার কর্মফল ব্যর্থ হবে, সে আখিরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। সূরা ১৯, মারইয়ামের ৭২ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ অত:পর আমি নাজাত দিব তাদের যারা তাকওয়া করেছে এবং রেখে দিব সীমালংঘনকারীদের সে জাহান্নামে নতজানু অবস্থায়।

১৯. শিরক ও কুফর ছাড়া অন্যসব গুনাহ্

শিরক ও কুফর থেকে মুক্ত কোন ব্যক্তি ছগীরা অথবা কবীরা গুনাহ্ করলে আর তওবা না করে মারা গেলে, তার ব্যাপার আল্লাহ্‌র ইখতিয়ারে। তিনি ইচ্ছা করলে মাফ করে দিবেন, ইচ্ছা করলে পাপ অনুযায়ী শাস্তি দিবেন। একথা কখনো নয় যে, সে চিরকাল জাহান্নামে আযাব পেতে থাকবে। পাপের জন্য নির্ধারিত শাস্তি ভোগের পর, সে অনন্তকালের জন্য বিহিশতবাসী হবে। এ তার ঈমানের প্রতিদান। কাউকে শাস্তি প্রদান করা আল্লাহ্‌র ইনসাফ। কাউকে ক্ষমা করা তাঁর করুণা। ক্ষমা করা তা শাফায়াতের কারণেও হতে পারে। আর তা ছাড়াও হতে পারে।

২০. রিয়া ও অহংকার কর্মফল বিনষ্ট করে

লোক দেখানোর জন্য ও আত্মপ্রচারের জন্য কোন কাজ করলে, কিংবা অহংকার করলে কর্মফল বিনষ্ট হয়ে যায়। কর্মফল লাভের মূল ভিত হলো নিয়ত। নিয়তের সততা ও নিষ্ঠা কর্মের ফলাফল নির্ণয়ের নিয়ামক। লোক দেখানো কাজ ও আত্মপ্রচারের লক্ষ্যে কৃত কাজের মধ্যে যেহেতু ইসলাম বা সততা নেই, আছে মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার প্রবণতা, আছে মানুষের সমর্থন, স্বীকৃতি ও স্তুতি অর্জন করার আকাঙ্খা, নেই এতে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্য, তাই এ ধরনের মানসিকতা ব্যক্তির কর্মফলকে বিফল করে দেয়। সূরা কাহফ ১৮, আয়াত ১১০-এ বর্ণিত হয়েছে ঃ যে কেউ তার প্রতিপালকের সাক্ষাত আকাঙ্খা করে, সে যেন ভাল কাজ করে এবং তার প্রতিপালকের ইবাদতে কাউকে শরীক না করে। এখানে ইঙ্গিতে বলা হয়েছে যে, কোন ব্যক্তি কোন কাজ আল্লাহ্‌র ইবাদত হিসাবে করলে এবং সে কাজে লোক দেখানো বা আত্মপ্রচারের উদ্দেশ্য থাকলে, তা প্রকৃতপক্ষে শিরক হয়। কারণ ইবাদত

ও রিয়া দু'টি একত্র হলে হয় দু'টি সমান সমান হবে, নয়তো একটি প্রবল ও অন্যটি দুর্বল হবে। এ অবস্থায় এ ধরনের ইবাদত শিরক বৈ আর কিছু নয়। এতে তার কর্মফল বিনষ্ট হয়ে যাবে এবং শাস্তির যোগ্য গণ্য হবে। কেননা হাদীসে এসেছে ঃ যদি কেউ কোন কাজ আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে করে আর তাতে অন্য কাউকে শরীক করে, তবে সে যেন তার প্রতিফল আল্লাহ্ ছাড়া অন্যের কাছে চায়। হাদীসে আরো বর্ণিত আছে ঃ আল্লাহ্ এমন কোন কর্ম গ্রহণ করেন না, যার মধ্যে বিন্দু পরিমাণ রিয়া রয়েছে।

ইমাম আ'যম বলেন ঃ রিয়া যেভাবে আমল বাতিল করে দেয়, ঠিক তদ্রূপ অহঙ্কারও আমল বাতিল করে দেয়। এখানে রিয়া ও অহংকার এ দু'টিকে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে যে, এছাড়া অন্যসব মন্দ স্বভাব ও পাপ চরিত্র আমল বাতিল করে না, বরং ক্ষতি করে। কেননা সূরা হুদ ১১, আয়াত ১১৪-এ আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ নিশ্চয় সৎকর্ম মিটিয়ে দেয় অসৎ কর্ম। এতো উপদেশ তাদের জন্য, যারা উপদেশ গ্রহণ করে। হাদীসে কুদসীতে এসেছে ঃ আমার রহমত অতিক্রম করেছে আমার গযবকে। হাদীসে আরো বর্ণিত হয়েছে ঃ দুশ্চরিত্র কর্মফলকে বিনষ্ট করে যেমন ভিনিগার মধুকে নষ্ট করে। রিয়া ও অহংকার দুশ্চরিত্রের মধ্যে বড় দু'টি চরিত্র। তবে কারো কারো মতে এছাড়াও অনেক মন্দ স্বভাব রয়েছে, যা আমল বাতিল করে দেয়। যেমন হাদীসে এসেছে ঃ পাঁচটি জিনিস রোযা বিনষ্ট করে অর্থাৎ রোযাদার যদি এ পাঁচটির কোন একটি করে তাহলে সে যেন দিনের বেলায় ইফতার করলো। এ পাঁচটি হলো- পরনিন্দা, মিথ্যা, অপবাদ, মিথ্যা শপথ ও কামুক দৃষ্টি।

২১. নবীদের মু'জিযা ও ওলীদের কারামত সত্য

নবী-রাসূলদের নবুওয়াত ও রিসালাতের স্বপক্ষে দলীল হিসাবে চ্যালেঞ্জ স্বরূপ যেসব অস্বাভাবিক বিস্ময়কর ঘটনার অবতারণা হয়েছে, তা কুরআন ও হাদীস দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত। মু'জিযার জন্য নবুওয়াতের ও রিসালাতের দাবি থাকা শর্ত। আর কারামতের জন্য এ ধরনের শর্ত নেই। তবে কোন নবীর উম্মত হতে হবে। তার কারামত নবীর নবুওয়াতের সত্যতার স্বীকৃতি। ওলী তিনি, যিনি আল্লাহ্ সম্পর্কে ভাল অবহিত, তাঁর ইবাদতে সদা রত, তাঁর নিষেধসমূহ বর্জনকারী, পার্থিব ভোগ বিলাসে অনাসক্ত, ষড়রিপুর ওপর নিয়ন্ত্রণকারী। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা মু'মিনের ফিরাসাতকে ভয় করবে, কেননা সে দেখে আল্লাহ্‌র নূর দিয়ে। তারপর তিনি সূরা আল-হিজর ১৫, আয়াত ৭৫ তিলাওয়াত করেন ঃ নিশ্চয় এতে রয়েছে নিদর্শন দূরদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তিদের জন্য। ফিরাসত-দূরদৃষ্টি বা অন্তর্দৃষ্টি তিন প্রকার ঃ ফিরাসতে ঈমানিয়া, যা ঈমানের কারণে আল্লাহ্ তা'আলা অন্তরে পয়দা করেন, ফিরাসাতে রিয়াযিয়া, যা সাধনার মাধ্যমে অর্জন করে এবং ফিরাসাতে খালকিয়া, যা স্বভাবজাত। এখানে যে ফিরাসাতের কথা হাদীসে বলা হয়েছে তা প্রথম প্রকার ফিরাসাত। হযরত উমর

(রা)-এর পত্রের দরুণ নীলনদের প্রবাহ্ সঞ্চারণ ; মদীনার মসজিদের মিম্বারে দাঁড়িয়ে নিহাওয়ান্দের যুদ্ধের সেনাপতিকে পাহাড়ের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করার নির্দেশ প্রদান ও তাঁর সে নির্দেশ শুনে সে অনুযায়ী কাজ করা ; হযরত খালিদ (রা)-এর বিষ পান করা ও তাতে কোন ক্রিয়া না করা ইত্যাদি সাহাবীদের থেকে প্রদর্শিত কয়েকটি কারামত। নবী-রাসূলদের মু'জিযাসমূহ কুরআনে ও হাদীসে বর্ণিত রয়েছে।

২২. আল্লাহ্‌র দুশমনদের থেকে প্রকাশিত অলৌকিক ঘটনা

ইবলীস, ফিরআউন, দাজ্জালের মত আল্লাহ্‌র দুশমনদের থেকে যেসব অলৌকিক ঘটনা সংঘটিত হয়েছে, সেসব না মু'জিযা আর না কারামত। সেগুলো তাদের কার্য সম্পাদনের বেলায় প্রয়োজন হয়েছিল বিধায় আল্লাহ্ তা'আলা তাদের দিয়েছেন। কেননা এ পার্থিব জীবনে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অপার করুণায় ও অসীম দয়ায় স্বীয় সৃষ্টির প্রয়োজন পূরণের জন্য এমনকি তাঁর দুশমনদেরও আবশ্যকীয় উপকরণ সরবরাহ্ করেন। এতে দুনিয়ায় তাদের সময় দেওয়া হয় এবং কিয়ামতে শাস্তি প্রদানের ক্ষেত্র প্রস্তুত করা হয়। সূরা ৭ আল-আ'রাফের ১৮২-১৮৩ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ যারা আমার নিদর্শন সমূহ প্রত্যাখ্যান করে, আমি তাদের এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবার জন্য ধরব যে, তারা জানতেও পারবে না। আমি তাদের সময় দিয়ে থাকি, আমার কৌশল অত্যন্ত দৃঢ়। সূরা ৩ আলে ইমরানের ১৭৮ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ মনে করে না যেন তারা যারা কুফরী করেছে যে, আমি অবকাশ দেই তাদের মঙ্গলের জন্য ; আমি তো অবকাশ দেই যাতে তারা আরো পাপ বৃদ্ধি করে। তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি। সূরা ৬৮ আল-কালামের ৪৪-৪৫ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ যারা আমাকে ও এ বাণীকে মিথ্যা সাব্যস্ত করে, তাদের ছেড়ে দাও আমার হাতে, তাদের আমি ক্রমে ক্রমে এমনভাবে ধরব যে, তারা জানতে পারবে না। আমি তো তাদের অবকাশ দেই। আর আমার কৌশল অত্যন্ত মযবুত।

হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যখন তুমি দেখবে যে, আল্লাহ্ কোন বান্দাকে সে যা ভালবাসে সে নিয়ামত দান করেন, অথচ সে পাপী, তখন জেনে রেখো, এরূপ হলো তাকে অবকাশ দেয়ার জন্য। তারপর তিনি তিলাওয়াত করলেন সূরা আল-আন'আমের ৪৪ আয়াত ঃ যখন তারা ভুলে গেল যে উপদেশ তাদের দেয়া হয়েছিল তা, তখন আমি উন্মুক্ত করে দিলাম তাদের জন্য সবকিছুর দ্বার। অবশেষে যখন তারা উল্লসিত হয়ে পড়ল যা তাদের দেয়া হয়েছে তাতে, তখন পাকড়াও করলাম তাদের অকস্মাৎ, ফলে তারা হয়ে পড়ল হতবাক নিরাশ। আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর অবাধ্য বান্দাদেরও তাদের পার্থিব জীবনের আকাঙ্খা পূরণে নিরাশ করেন না। তাদের তিনি তাদের কামনা ও বাসনা অনুযায়ী দিয়ে থাকেন। এ তাঁর শাশ্বত নীতি। এর ফলে তারা সাময়িকভাবে চমক সৃষ্টি করতে সমর্থ হয়। পরিণামে

তারা হয় ব্যর্থকাম, নিরাশ। এতে তাদের ঔদ্ধত্য আরো বৃদ্ধি পায়। ইতিহাসে এর প্রচুর বৃত্তান্ত রয়েছে। যেমন ইবলীসের প্রার্থনা ঃ হে আমার রব! আমাকে অবকাশ দিন পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত। জবাবে আল্লাহ্ বললেন ঃ অবশ্যই তুমি তাদের শামিল, যাদের অবকাশ দেওয়া হয়েছে অবধারিত সময় উপস্থিত হওয়ার দিন পর্যন্ত। অবকাশ প্রাপ্তির পর সে বলল ঃ হে আমার রব! আপনি যে আমাকে বিপথগামী করলেন সেজন্য আমি পৃথিবীতে মানুষের কাছে পাপ কাজকে শোভন করে তুলব এবং তাদের সবাইকে বিপথগামী করব, তবে তাদের মধ্যে তোমার সেসব বান্দাদের নয়, যারা বিশুদ্ধ চিত্ত নিষ্ঠাবান। (১৫ ঃ ৩৬-৪০)

ফিরআউনের অলৌকিক ঘটনার মধ্যে অন্যতম হলো যে, যখন সে ঘোড়ায় আরোহিত অবস্থায় তার বালাখানায় নামতে অথবা উঠতে চাইতো, তখন তার ঘোড়ার পা প্রয়োজন অনুযায়ী লম্বা ও খাটো হতো। এছাড়া তার নির্দেশে নীলনদ প্রবাহিত হত, যেমন আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে ঃ ফিরআউন তার লোকদের ডেকে বলল, হে আমার কওম! নয় কি মিসর রাজ্য আর এসব নদ-নদী যা প্রবাহিত হয় আমার পাদদেশে? তোমরা কি দেখ না ? আর নই কি আমি শ্রেষ্ঠ ঐ লোকটির চাইতে, যে হীন, নীচ এবং স্পষ্ট করে কথাও বলতে পারে না ? (৪৩ ঃ ৫১, ৫২) ফিরআউন সম্পর্কে হযরত জিবরাঈল (আ) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলেন ঃ আল্লাহ্‌র বান্দাদের মধ্যে আমি দু'জনকে সবচাইতে দুশমন জানি। জিনদের মধ্যে ইবলীস, কারণ সে আল্লাহ্‌র নির্দেশ অমান্য করে আদম (আ)-কে সিজদা করেনি। আর মানুষের মধ্যে ফিরআউন, কারণ সে দাবি করেছিল, "আমি তোমাদের শ্রেষ্ঠ প্রতিপালক।" (৭৯ ঃ ২৪) ফিরআউন ইবলীসের চাইতেও নিকৃষ্ট। ফিরআউন মানব সন্তান, তারপক্ষে অবাধ্যতা স্বাভাবিক নয়। কিন্তু ইবলীস জিন সন্তান, অবাধ্যতা তো তার স্বভাব। তাছাড়া ইবলীস মানুষকে সিজদা করতে অস্বীকার করে অবাধ্য হয়েছে, আর ফিরআউন অহংকার বশে স্বীয় স্রষ্টাকে অস্বীকার করে নিজেকে শ্রেষ্ঠ বলে দাবি করেছে।

কিয়ামতের পূর্বে দাজ্জাল পৃথিবীতে অনেক বিপর্যয় ঘটাবে। সে অনেক অলৌকিক ঘটনাও সংঘটিত করবে। যেমন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, দাজ্জাল কোন ব্যক্তিকে হত্যা করবে, আবার তাকে জেন্দা করবে। এসব সম্ভব এবং আল্লাহ্‌র ইচ্ছায় হবে।

২৩. আল্লাহ্ তা'আলা মাখলুক সৃষ্টির পূর্বেই স্রষ্টা এবং রিযকদানের পূর্বেই রিযকদাতা

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তাঁর যাবতীয় সিফাতসহ শাশ্বত, সদা বিদ্যমান। সৃষ্টি করা এবং রিযক দান করা তাঁর দু'টি সিফাত। আলাদা করে এ

দু'টিকে উল্লেখ করে ইমাম আ'যম এদিকে ইঙ্গিত করছেন যে, সবার এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, বর্ণিত বক্তব্যই সঠিক আকীদা।

২৪. আখিরাতে আল্লাহ্ তা'আলা পরিদৃষ্ট হবেন

কিয়ামতের দিন কোন কোন মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হবে, তাঁরা তাঁদের রবের দিকে তাকিয়ে থাকবে। (সূরা আল কিয়ামা ৭৫ ঃ ২২, ২৩) এ আয়াতে বিহিশতবাসী মু'মিনদের কথা বলা হয়েছে। সূরা আল-মুতাফ্ফিফীন এর ১৫ ও ১৬ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ যারা আখিরাতকে অস্বীকার করে, তারা কক্ষনো আল্লাহ্র দিকে তাকাতে পারবে না, তারা তো সেদিন তাদের রবের থেকে পর্দার অন্তরালে থাকবে, অবশেষে তারা জাহান্নামে প্রবেশ করবে। মু'মিনদের সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ তোমরা অবশ্যই তোমাদের রবকে দেখবে, যেমন তোমরা পূর্ণিমার রাতে পূর্ণচন্দ্র দেখে থাক। এ হাদীসটি ২১জন প্রবীণ সাহাবা রিওয়ায়াত করেছেন এবং বুখারী ও মুসলিমে উদ্ধৃত হয়েছে। সূরা ইউনুস ১০, আয়াত ২৬-এ বলা হয়েছে ঃ যারা নেক কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে মঙ্গল এবং আরো কিছু বেশি। কখনো আচ্ছন্ন করবে না তাদের মুখমণ্ডলকে কালিমা ও হীনতা। তাঁরাই জান্নাতের অধিবাসী, তাঁরা সেথায় চিরস্থায়ীভাবে থাকবে। এখানে 'যিয়াদা' বা 'আরো কিছু বেশি' দ্বারা বিহিশতে মু'মিনদের আল্লাহ্র দরশন বুঝান হয়েছে। এ সম্পর্কে সহীহ মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে ঃ আহলে জান্নাত যখন জান্নাতে দাখিল হবে তখন আল্লাহ্ বলবেন, তোমরা কিছু চাও আমি বাড়িয়ে দিব। তাঁরা বলবে, আপনি কি আমাদের চেহারা উজ্জ্বল করেননি ? আমাদের বিহিশতে দাখিল করাননি ? আমাদের দোযখ থেকে নাজাত দেননি ? তখন তিনি তাঁদের থেকে পর্দা তুলে নেবেন এবং আল্লাহ সুব্হানাহু ওয়া তা'আলার চেহারার দিকে তাঁরা তাকাবেন। তাঁদের এ যাবত যা কিছু প্রদান করা হয়েছে তার কোন কিছুই তাঁদের কাছে এ দরশনের চাইতে অধিক প্রিয় হবে না।

জান্নাতে আল্লাহ্কে প্রত্যক্ষভাবে দেখার ধরণ কি হবে, তা নিয়ে বিভিন্ন মত রয়েছে। ইমাম আ'যমের মতে তাঁকে দেখা যাবে, তবে সে দেখা পার্থিব দেখার মত নয়। দুনিয়ায় কোনকিছু দেখার জন্য দুটি দিক রয়েছে--দর্শক ও দৃশ্য। এ দু'টির জন্য প্রয়োজন দর্শকের ও দৃশ্যের মধ্যে স্থান, কাল ও আকৃতির বিদ্যমানতা। জান্নাতে এ দু'দিক থাকবে। তবে দৃশ্যের আকৃতি, প্রকৃতি ও ধরন কি হবে, তা জানা নেই। এবং দরশনের কালে দর্শন ও দৃষ্টের মাঝে দূরত্বের প্রশ্নও থাকবে না। তাই জান্নাতে আল্লাহ্কে দর্শনের আকীদা পার্থিব দর্শনের সাথে যে কোন প্রকার তুলনা থেকে মুক্ত ও পবিত্র। সূরা আল-আন'আমের ১০৩ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ আয়ত্তে আনতে পারে না আল্লাহ্কে দৃষ্টিশক্তি, তবে তিনি আয়ত্তে রেখেছেন দৃষ্টিশক্তি। তিনি সূক্ষ্মদর্শী,

সম্যক পরিজ্ঞাত। এ আয়াতে 'দৃষ্টিশক্তির আয়ত্তে আনাকে' নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু 'দেখা' কে নিষেধ করা হয়নি। ادراك ও رؤية এক নয়। তাই ইবরাহীম (আ) ও মূসা (আ) আল্লাহ্‌র কাছে দেখতে চাইলে কেউই ادراك শব্দ ব্যবহার করেননি। ইবরাহীম (আ) বলেছিলেন ঃ হে আমার রব! তুমি আমাকে দেখাও কিভাবে মৃতকে জীবিত কর। আল্লাহ্ বললেন ঃ তবে কি তুমি বিশ্বাস কর না ? ইবরাহীম বললেন ঃ অবশ্যই বিশ্বাস করি, তবে কেবল আমার চিত্ত প্রশান্তির জন্য এরূপ চাই। (২ ঃ ২৬০) মূসা (আ) বলেছিলেন ঃ হে আমার রব! তুমি আমাকে দেখাও, আমি তোমাকে দেখব। আল্লাহ বললেন, কখনো তুমি আমাকে দেখতে পাবে না। (৭ ঃ ১৪৩) মোটকথা কুরআন ও হাদীসে এ সম্পর্কে যে বর্ণনা রয়েছে, তা-ই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা। ইমাম আবূ মানসূর আল-মাতুরীদী এ সম্পর্কে বলেন ঃ আমরা এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসের প্রমাণের ওপর বিশ্বাসী।

২৫. ঈমান হলো মুখের স্বীকৃতি ও অন্তরের বিশ্বাস

ইমাম আ'যমের মতে মুখের স্বীকৃতি ও অন্তরের বিশ্বাস-এ উভয় মিলে ঈমান। শুধু মুখের স্বীকৃতিই যদি ঈমান হতো, তাহলে সব মুনাফিক মু'মিন হতো। কেননা তারা তো মুখে স্বীকার করে। আর শুধু অন্তরের প্রত্যয়ই যদি ঈমান হতো তাহলে সব আহলে কিতাব মু'মিন হতো। কেননা তারা রাসূলুল্লাহ্‌কে তাদের কিতাবে বর্ণিত কথায় প্রকৃত রাসূল বলে জানতো। মুনাফিকদের সম্পর্কে আল-কুরআনের ঘোষণা ঃ যখন মুনাফিকরা আপনার কাছে আসে তখন তারা বলে, "আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র রাসূল। আল্লাহ্ জানেন যে, নিশ্চয়ই আপনি তাঁর রাসূল। আর আল্লাহ্ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, নিশ্চয়ই মুনাফিকরা তো মিথ্যাবাদী।" (৬৩ ঃ ১)

আহলি কিতাব সম্পর্কে আল-কুরআনের ঘোষণা ঃ যাদের আমি কিতাব দিয়েছি তারা মুহাম্মদকে সেরূপ জানে, যেরূপ তারা জানে নিজেদের সন্তানদের। আর তাদের একদল তো জেনেশুনে সত্য গোপন করে থাকে। (২ ঃ ১৪৬)

আল্লাহ্ তা'আলা মুনাফিকদের মৌখিক সাক্ষ্যকে তাদের অন্তরের বিশ্বাসের বিপরীত হওয়ায় মিথ্যা বলে আখ্যায়িত করেছেন। তাই তারা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে এসে ইসলামে বিশ্বাসের কথা বললেও তাদের কথা অনুযায়ী তাদের মু'মিন হিসাবে স্বীকার করা হয়নি। বরং তাদের নাম দেয়া হয়েছে 'মুনাফিক'। অতএব শুধু মৌখিক স্বীকৃতি 'ঈমান' নয়। মুনাফিকদের মৌখিক স্বীকৃতি ছিল কিন্তু ছিল না অন্তরের বিশ্বাস। অপরপক্ষে আহলি কিতাব তো ভাল করেই জানতো যে, মুহাম্মদ (সা) আল্লাহ্‌র রাসূল। তাদের এ জানা ঈমানের জন্য যথেষ্ট ছিল না। তাদের মধ্যে কতক তাঁকে আরবদের নবী মনে করতো। এতেও তারা মু'মিন হয়নি। কারণ তারা যতক্ষণ পর্যন্ত

তাঁকে সারা জাহানের জন্য প্রেরিত আল্লাহ্‌র রাসূল বলে বিশ্বাস না করবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তাদের মু'মিন বলা যাবে না। ঈমানের জন্য তাই ইকরার ও তাসদীক উভয়ই জরুরী। এ দু'য়ের সমন্বয় হলেই ঈমান পাওয়া যাবে, অন্যথায় নয়।

তাসদীক বা অন্তরের প্রত্যয় ঈমানের রুকন বা মূল ভিত। আর ইকরার বা মৌখিক স্বীকৃতি ঈমানের শর্ত। কেননা অন্তরের ব্যাখ্যাদাতা হলো মুখ। মুখের দ্বারাই প্রকাশ করা হয় অন্তরের ভাব ও বিশ্বাস। তাই তাসদীক (অন্তরের প্রত্যয়) ঈমানের জন্য থাকতে হবে। এর অবিদ্যমানতা ঈমানের অবিদ্যমানতার নামান্তর। কিন্তু কোন বিশেষ অবস্থায় ইকরার বা মৌখিক স্বীকৃতি না পাওয়া গেলে ঈমান নেই বলা যাবে না। যেমন সূরা নাহলের ১০৬ আয়াতে বর্ণিত হয়েছে ঃ "কেউ কুফরী করলে আল্লাহ্‌র সঙ্গে তার ঈমানে পর এবং কুফরীর জন্য হৃদয় উন্মুক্ত রাখলে তার ওপর আপতিত হবে আল্লাহ্‌র ক্রোধ এবং তার জন্য রয়েছে মহাশাস্তি ; তবে তার জন্য নয়, যাকে কুফরীর জন্য বাধ্য করা হয় কিন্তু তার চিত্ত ঈমানে দৃঢ়, অবিচলিত।" যখন প্রকাশ করা সম্ভব তখন লুক্কায়িত-লালিত বিশ্বাস প্রকাশ না করলে কুফরী হবে। কিন্তু যখন প্রকাশ করলে জীবনের ভয় রয়েছে তখন তা গোপন করা বৈধ, এমনকি কুফরীর জন্য বাধ্য করলে সে কাফির হবে না। তাই ইমাম আ'যমের মতে ইজমালী ঈমান হলো, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওপর ও তিনি যা আল্লাহ্‌র তরফ থেকে নিয়ে এসেছেন তাতে বিশ্বাস করা। এটুকু করলেই একজন মোটামুটি ভাবে ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হবে। তবে বিস্তারিত ভাবে প্রশ্ন করলে কেউ যদি ঈমানের জন্য প্রয়োজন এমন কোন বিষয় প্রত্যাখ্যান করে বা না মানে, তা হলে তার ঈমান নেই, সে কাফির। যেমন মদ ও সুদ হারাম হওয়া, নামায ফরয হওয়া ইত্যাদি। তবে ইজতিহাদী ব্যাপারের কোন কিছু কেউ অস্বীকার করলে কুফরী হবে না। ইমাম আবূ মানসূর মাতুরীদীর মতে, ঈমান হলো অন্তরের বিশ্বাস, আর দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র নির্দেশ অনুযায়ী জীবন যাপনের জন্য ইকরার হলো ঈমানের শর্ত। কেননা তাসদীক গোপন ও অদৃশ্য ব্যাপার। বিধান মোতাবেক সমাজ পরিচালনার জন্য চাই প্রকাশ্য স্বীকৃতি। মুখের স্বীকৃতির মাধ্যমে অন্তরের গোপন বিশ্বাসের প্রকাশ ঘটে। অতএব যে ব্যক্তি অন্তরে বিশ্বাস রাখলো কিন্তু মুখে প্রকাশ করলো না, সে আল্লাহ্‌র কাছে মু'মিন, কিন্তু দুনিয়ার বিধান মোতাবেক মু'মিন নয়। অপরপক্ষে, যে ব্যক্তি মুখে ইকরার করলো, কিন্তু অন্তরে বিশ্বাস করলো না, যেমন মুনাফিক, সে আল্লাহ্‌র কাছে মু'মিন নয়, কিন্তু দুনিয়ার বিধানে মু'মিন। আল কুরআনের অনেক আয়াতে এ সম্পর্কে সমর্থন রয়েছে, যেমন সূরা মুজদালা ৫৮, আয়াত ২২ ; সূরা ৪৯, আয়াত ১৪ ; সূরা ১৬, আয়াত ১০৬ ইত্যাদি এবং বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবন মাজা প্রভৃতি হাদীস গ্রন্থে উদ্ধৃত উসামা (রা)-কে বলা রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর হাদীস, যখন সে এক ব্যক্তিকে লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু

বলার পরও হত্যা করেছিল ঃ তুমি কি তার হৃদয় চিরে দেখেছো যে, সে সত্যবাদী না মিথ্যাবাদী ?

২৬. ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধি নেই

আসমানের অধিবাসী যেমন ফিরিশতা ও জান্নাতবাসী এবং দুনিয়ার অধিবাসী যেমন আম্বিয়া, আউলিয়া, নেককার মু'মিন ও বদকার মু'মিন, এদের ঈমানে মু'মিন হিসাবে হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। কর্মের কারণে মু'মিনের প্রতি প্রতিদানের প্রেক্ষিতে ঈমানের হ্রাস-বৃদ্ধির কথা আল-কুরআনে ও হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। যেমন সূরা আনফাল ৮, আয়াত ২-এ বলা হয়েছে ঃ "মু'মিন তো তাঁরাই, যাদের হৃদয় কম্পিত হয় যখন আল্লাহ্‌কে স্মরণ করা হয় এবং যখন তাঁর আয়াত তাদের কাছে পাঠ করা হয় তখন তা তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে আর তাঁরা তাদের রবের ওপর ভরসা করে।" হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর কাছে ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় কি-না জানতে চাইলে তিনি উত্তরে বলেন ঃ "হাঁ, তা বৃদ্ধি পায়, যতক্ষণ না সে তার ধারককে বিহিশতে প্রবেশ করায়। এবং তা হ্রাস পায়, যতক্ষণ না তার ধারককে দোযখে প্রবেশ করায়।" এখানে ঈমানদারের আমলের কথা বলা হয়েছে। নেক আমলের কারণে ঈমানদার প্রথমেই বিহিশতে প্রবেশ করবে। আর বদ আমলের কারণে গুনাহ্‌গার ঈমানদার প্রথমে দোযখে ও পরে বিহিশতে প্রবেশ করবে। আর আল্লাহ্‌র স্মরণ ও তিলাওয়াতে কুরআন মু'মিনের ঈমানে দৃঢ়তা দান করে। আসল ঈমান অপরিবর্তিত থাকে। ইমাম আ'যম তাঁর 'আল অসিয়াত' কিতাবে লিখেছেন যে, ঈমান বাড়েও না কমেও না, কেননা ঈমানের বৃদ্ধি কুফরী হ্রাসের সম্ভাবনা ছাড়া অকল্পনীয়। অনুরূপভাবে ঈমানের হ্রাস হওয়া কুফরী বৃদ্ধির সম্ভাবনা ছাড়া কল্পনা করা যায় না। এক ব্যক্তি কিরূপে এক অবস্থায় একাধারে মু'মিন ও কাফির হতে পারে ? যে মু'মিন সে নিঃসন্দেহে মু'মিন এবং যে কাফির সে তো নিঃসন্দেহে কাফির। যেমন সূরা নিসা ৪, আয়াত ১৫১-তে বলা হয়েছে ঃ তারা প্রকৃত অর্থে কাফির, আর আমি কাফিরদের জন্য তৈরি করে রেখেছি লাঞ্ছনাদায়ক আযাব। সূরা ৮ আনফালের ৪ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ তারা তো প্রকৃত অর্থে মু'মিন, তাদের জন্য রয়েছে মর্যাদার আসন তাদের রবের কাছে, আরো রয়েছে অনুকম্পা ও সম্মানজনক জীবনোপকরণ।

মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর উম্মতরা সকলেই মু'মিন। তাঁরা কাফির নয়। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সর্বসম্মত অভিমত হলো যে, গুনাহ ঈমানকে বিদূরিত করে না। একজন মু'মিন গুনাহ করতে পারে এবং গুনাহ্‌র কারণে তার ঈমান চলে যায় না। যদিও এ ব্যাপারে মু'তাযিলা ও খারিজিদের মত স্বতন্ত্র।

আল্লাহ্‌র ইবাদত ও রাসূলের আনুগত্য ঈমানের ফসল। ফসলের ক্ষেত্রে কম বেশির সুযোগ রয়েছে। ঈমানের কারণে মানুষের মনে আল্লাহ্‌র প্রতি মহব্বত পয়দা

হয়। আমলের কারণে তা বৃদ্ধি পায় ও হ্রাস পায়। তাই হ্রাস-বৃদ্ধি আমলের সাথে সম্পৃক্ত, ঈমানের সঙ্গে নয়।

ইমাম রাযীর মতে, ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধি কবূল করে না মূল বিশ্বাস হিসাবে, তবে একীনের দিক দিয়ে নয়। কেননা মু'মিনদের স্তর বিভিন্ন। আইনুল একীনের স্তর ইলমুল একীনের স্তরের ঊর্ধ্বে। এ জন্যই ইবরাহীম (আ) বলেছিলেন ঃ হে আমার রব! আমাকে দেখাও কিরূপে তুমি মৃতকে জীবিত কর। আল্লাহ্ তাকে তার ঈমান সম্পর্কে প্রশ্ন করলেন ঃ তুমি কি ঈমান রাখ না? তিনি উত্তরে বললেন ঃ অবশ্যই আমি ঈমান রাখি, তবে আমার চিত্ত যাতে প্রশান্ত হয় তার জন্য দেখতে চাই। এতে হযরত ইবরাহীমের ঈমানে কোন হ্রাস-বৃদ্ধি হয়নি। হয়েছে তার অন্তরে প্রশান্তি। তাঁর ইলমুল একীন ছিল, তিনি চাইলেন আইনুল একীন, এদিক দিয়ে ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়। তবে মূল ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। একজন সাহাবীর ঈমান ও রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ঈমান, একজন সাধারণ মু'মিন ও একজন সাহাবীর ঈমান সমান নয়। হাদীসে বর্ণিত হয়েছে ঃ সমস্ত মু'মিনের ঈমানের সঙ্গে হযরত আবূ বকর সিদ্দীক (রা)-এর ঈমানের ওজন করলে তাঁর ঈমান নিশ্চিত প্রবল হবে। এ তাঁর একীনের দৃঢ়তার দরুণ। একীন ও বিশ্বাসের দৃঢ়তা ও দুর্বলতার নিরিখে ঈমানে হ্রাস-বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে। একজন মু'মিনের প্রকৃত ঈমানের দিক দিয়ে এ সম্ভাবনা নেই।

২৭. মু'মিনরা ঈমান ও তওহীদের দিক দিয়ে সমান, আমলের দিক দিয়ে বিভিন্ন

মূল ঈমান ও তওহীদের দিক দিয়ে সব মু'মিন সমান। তবে আমলের কারণে তাঁরা বিভিন্ন মর্যাদা ও অবস্থার অধিকারী হয়। তাই ইমাম মুহাম্মদ (র) বলেছেন ঃ আমি অপছন্দ করি যে, কেউ একথা বলবে, "আমার ঈমান জিবরাঈল (আ)-এর ঈমানের ন্যায়।" বরং তার বলা উচিত, "আমি ঈমান এনেছি তাতে, জিবরাঈল (আ) ঈমান এনেছেন যাতে।" ঠিক অনুরূপভাবে একথা বলাও ঠিক নয় যে, "আমার ঈমান নবীদের ঈমানের মত, অথবা আমার ঈমান হযরত আবূ বকরের ঈমানের মত ইত্যাদি।" তওহীদ ও ঈমানের নূর কারো অন্তরে সূর্যের মত, কারো অন্তরে চন্দ্রের মত, কারো অন্তরে তারকার মত, কারো অন্তরে প্রদীপের মত আবার কারো অন্তরে নিভু নিভু বাতির মত। এজন্যই তো হাদীসে এসেছে ঃ এ হলো দুর্বলতর ঈমান। আরো এসেছে ঃ সবল মু'মিন প্রিয়তর আল্লাহ্‌র কাছে দুর্বল মু'মিনের চাইতে।

ইমাম আ'যম (র) তাঁর 'আল অসিয়াত' গ্রন্থে লিখেছেন ঃ ঈমান ও আমল এক নয়, বরং ভিন্ন। কারণ অনেক সময় একজন মু'মিন থেকে আমলকে তুলে নেয়া হয়। কখনো তার থেকে ঈমান তুলে নেয়া হয় না। যেমন একজন মহিলাকে হায়েয অবস্থায় নামায পড়তে নিষেধ করা হয়েছে, কিন্তু তাকে ঈমান রাখতে বারণ করা হয়নি। তাকে রমযানের রোযা ভাঙ্গতে অনুমতি দিয়ে পরে কাযা করতে বলা হয়েছে,

কিন্তু ঈমান কাযা করতে বলা হয়নি। একজন গরীবের ওপর যাকাত ফরয নয়, কিন্তু তার ওপর ঈমান ফরয। তাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের কাছে ঈমান ও আমল আলাদা আলাদা বিষয়। আমল কখনো ঈমানের অংশ নয় কিংবা রুকন নয়, যেমন- মু'তাযিলীরা মনে করে। আল-কুরআনে বর্ণিত ঈমান ও আমলের নির্দেশে যে 'আত্‌ফ' (عطف) তা مغايرة বা পার্থক্য বুঝানোর জন্য, একত্বতা নির্দেশক নয়।

২৮. ইসলাম

গোপনে ও প্রকাশ্যে আল্লাহ্‌র নির্দেশ মেনে চলা হলো ইসলাম। তবে অভিধানে ঈমান ও ইসলাম স্বতন্ত্র অর্থ বহন করে। ঈমান অর্থ প্রত্যয়, বিশ্বাস। যেমন আল কুরআনে ইউসুফ (আ)-এর ঘটনায় তাঁর পিতার কাছে ভাইদের কথা আল্লাহ্ তা'আলা এভাবে বর্ণনা করেন ঃ আপনি তো আমাদের বিশ্বাস করার নন, যদিও আমরা সত্যবাদী। (১২ ঃ ১৬) ইসলাম অর্থ আনুগত্য করা, মেনে চলা। যেমন আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ তাঁকেই মেনে চলে যারা রয়েছে আসমানে ও যমীনে ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়। (৩ ঃ ৮২)। ঈমান হলো গোপন আনুগত্য আর ইসলাম হলো প্রকাশ্য আনুগত্য। এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে আল কুরআনের আয়াতে ঃ "মরুবাসীরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি। আপনি বলে দিন, তোমরা ঈমান আননি, কিন্তু বল, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। এখনো ঈমান প্রবেশ করেনি তোমাদের অন্তরে।" হাদীসে জিবরাঈল (আ)ও এ অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। সেখানে ঈমান শুধু অন্তরের বিশ্বাস এর জন্য এবং ইসলাম ইকরার ও আমলের জন্য ব্যবহৃত হয়েছে।

শরীয়তের পরিভাষায় ঈমান ও ইসলামের পৃথক পৃথক অর্থ থাকলেও কখনো ইসলাম ছাড়া ঈমান, কিংবা ঈমান ছাড়া ইসলাম পাওয়া সম্ভব নয়। যেমন আহলে কিতাব ও ইবলীসের প্রকাশ্য আনুগত্য ছিল না; যদিও অন্তরে আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্য ছিল। মুনাফিকদের প্রকাশ্য আনুগত্য ছিল কিন্তু অন্তরের বিশ্বাস, যা গোপন আনুগত্য, তা ছিল না। তাই এদের ক্ষেত্রে ঈমান ও ইসলাম পরিভাষা ব্যবহার করা যাবে না। ইসলাম ও ঈমান অবিভাজ্য বিষয়। যেমন মানুষের পেট ও পিঠ। এ দু'য়ের কোনটি বাদ দিয়ে মানুষ কল্পনা করা যায় না। যদিও দু'টি এক নয়। ঈমানের স্থান কলব বা অন্তর। আর ইসলামের স্থান কালব বা দেহ।

২৯. দীন

ঈমান, ইসলাম ও শরীয়তের যাবতীয় আহকামের সমন্বয় হলো দীন। যখন দীন বলা হবে তখন তার দ্বারা বুঝা যাবে অন্তরের বিশ্বাস, প্রকাশ্য স্বীকৃতি এবং শরীয়তের আহকাম কবূল করা। যেমন আল-কুরআনের ঘোষণা ঃ যে কেউ অন্বেষণ করবে ইসলাম ছাড়া অন্য কোন দীন, কক্ষোনো কবূল করা হবে না তা তার থেকে। (৩ ঃ

৮৫) নিশ্চয়, দীন হলো আল্লাহ্র কাছে ইসলাম। (৩ ঃ ১৯) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য দীনের ব্যাপারে কোন কষ্টের কিছু আরোপ করেননি। (২২ ঃ ৭৮) আমি তোমাদের জন্য ইসলামকে দীন হিসাবে পছন্দ করেছি। (৫ ঃ ৩)

ইমাম আ'যম ঈমান, ইসলাম ও শরীয়তের সমন্বিত নাম দিয়েছেন দীন। এর কোনটির ওপর আলাদাভাবে দীনের প্রয়োগ তিনি করেননি। সমস্ত নবীদের দীন এক। তবে তাদের শরীয়ত আলাদা। যেমন আল-কুরআনের বর্ণনা ঃ তোমাদের প্রত্যেকের জন্য আমি দিয়েছি বিধান ও পদ্ধতি (৫ ঃ ৪৮)। আবূ হুরায়রা (রা) থেকে বর্ণিত ঃ সমস্ত নবীদের দীনের মূল এক, তা হলো তওহীদ। 'আকীদাতুত্ তাহাবিয়ায়' বলা হয়েছে ঃ আসমান ও যমীনে আল্লাহ্র দীন হলো মধ্যপথ।

৩০. মানুষ তার ক্ষমতা অনুযায়ী আল্লাহকে জানে ও তাঁর ইবাদত করে

আল-কুরআনে আল্লাহ্ তা'আলা যেভাবে নিজেকে এক ব্যক্ত করেছেন, যে সব সিফাত নিজের জন্য ব্যবহার করেছেন, সে সবের আলোকে মানুষ তার সীমিত শক্তিতে যতটুকু সম্ভব ততটুকুই তাঁকে জানে। প্রকৃত সত্তা ও তাঁর যাত কি, তা তিনি ছাড়া কেউ জানে না। আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্ জানেন যা কিছু আছে তাদের সামনে এবং যা কিছু রয়েছে তাদের পেছনে, কিন্তু তারা তাঁকে জ্ঞান দ্বারা আয়ত্তে আনতে পারে না। (২০ ঃ ১১০) হযরত জুনায়েদ (র) কে তওহীদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি উত্তরে বলেন ঃ তিনি কাদীম, নিত্য, শাশ্বত, অবিনশ্বর, তিনি ছাড়া সবকিছু অনিত্য, নশ্বর। আল্লাহ্র যাত ও সিফাতের সঙ্গে কোনক্রমেই সৃষ্টির কোন তুলনা, সাদৃশ্য করা যাবে না। কেননা আল্লাহ্ তা'আলা বলেছেন ঃ কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা (৪২ ঃ ১১)। তবে যে সব সিফাত সাধারণ অর্থে মানুষের জন্য প্রযোজ্য, তা যখন আল্লাহ্র জন্য ব্যবহৃত হয়, তখন সেখানে শুধু শাব্দিক সাযুজ্যতাই মনে করতে হবে, তার উর্ধ্বে কিছু নয়। যেমন শ্রোতা, দ্রষ্টা, শক্তিশালী, দয়ালু ইত্যাদি। হযরত আলী (রা)-কে তওহীদ সম্পর্কে প্রশ্ন করা হলে তিনি জবাব দিয়েছিলেন ঃ তুমি জেনে রেখো যে, যা কিছু তোমার মনে উদয় হয় অথবা তোমার খেয়ালে যা তুমি ভাবো, অথবা যে কোন অবস্থায় যা তুমি কল্পনা কর, আল্লাহ্ এসবের পেছনে আছেন।

যেমন কোন বান্দা আল্লাহ্কে নিজের ক্ষমতানুযায়ী জানে, ঠিক তেমনি সে তার সাধ্যানুযায়ী তাঁর নির্দেশ পালন করে তাঁর ইবাদত করে। যেভাবে তাঁর ইবাদত করা উচিত এবং যে ইবাদতের তিনি হকদার, বান্দা কখনো তা করতে পারে না, করার শক্তি রাখে না। এজন্যই তাফসীরকাররা বলেন যে, আলে ইমরানের ১০২ আয়াতে বর্ণিত ঃ "হে মু'মিনরা! তোমরা আল্লাহ্কে যথার্থভাবে ভয় করবে এবং কক্ষোনো

মরবে না মুসলিম না হয়ে", মনসূখ হয়েছে সূরা তাগাবুনের ১৬ আয়াত দ্বারা। সে আয়াতে বলা হয়েছে ঃ তোমরা ভয় কর আল্লাহ্‌কে যথাসাধ্য। আল্লাহ্‌কে যথার্থভাবে ভয় করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। আল্লাহ্ যেসব নিয়ামত মানুষকে দান করেছেন তার জন্য তাঁর শুকরিয়া আদায় করা, তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী আমল করা, এক কথায় তাঁর যথাযথ ইবাদত করা বান্দার পক্ষে অসম্ভব। এদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে আল কুরআনে ঃ তিনিই আল্লাহ্, যিনি সৃষ্টি করেছেন আসমান ও যমীন, যিনি আসমান থেকে পানি বর্ষণ করে তা দিয়ে তোমাদের জীবিকার জন্য ফল-মূল উৎপাদন করেন, যিনি তোমাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন নৌ-যান, যাতে তাঁর বিধানে সাগরে বিচরণ করে এবং যিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন নদ-নদী। তিনি তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন চাঁদ-সুরুজ যা তাঁর নির্দেশের অবিরাম অনুবর্তী এবং তোমাদের কল্যাণে নিয়োজিত করেছেন রাত ও দিন। এবং তিনি তোমাদের দিয়েছেন যা তোমরা চেয়েছো তা। যদি তোমরা আল্লাহ্‌র নিয়ামত গণনা কর তাহলে তার সংখ্যা নির্ণয় করতে পারবে না। অবশ্য মানুষ অতিমাত্রায় সীমালংঘনকারী, অকৃতজ্ঞ। (১৪ ঃ ৩২-৩৪)

এখানে আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর কয়েকটি নিয়ামতের উল্লেখ করে বলেছেন যে, অগণিত নিয়ামত যা বান্দাদের প্রদান করা হয়েছে, তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা এবং সে অনুযায়ী ইবাদত করা তো দূরের কথা, তারা যদি তাদেরকে দেয়া নিয়ামত গণনা করতে চায়, তবে গণনা করে তা শেষ করতে পারবে না। অতএব বান্দা শুধু তার সাধ্যানুযায়ী শুকরিয়া আদায় করার নিমিত্ত তাঁর ইবাদত করবে। এ দিকেই আল-কুরআনে ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে পারে না যদি আল্লাহ্ ইচ্ছা না করেন, একমাত্র তিনিই তাকওয়া প্রাপ্তির যোগ্য এবং তিনিই ক্ষমা করার মালিক। (৭৪ ঃ ৫৬)

বান্দা শুধু আল্লাহ্‌কেই ভয় করবে। তাঁর ইবাদত করবে। তবে যদি কোন বান্দার কসূর হয়ে যায়, যথাসাধ্য ইবাদত করতে না পারে, তবে তিনি তো ক্ষমার মালিক। তাকে মাফ করতে পারেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) কোন ইবাদত থেকে মুক্ত হওয়ার পর সদা ইস্তিগফার করতেন। এতে এদিকে ইঙ্গিত রয়েছে যে, ইবাদতের যে হক ছিল সে হক হয়তো আদায় হয়নি, তাই আল্লাহ্‌র ক্ষমা প্রার্থনা করে নিতেন। আল-কুরআনে এর প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে ঃ কিছুতেই মানুষ পরিপূর্ণ করতে পারে না তা, যা তাকে তাঁর রব নির্দেশ দিয়েছেন। (৮০ ঃ ২৩)

৩১. আহলে ইসলাম মুকাল্লাফ হিসাবে সমান

আল্লাহ্‌কে জানা, দীনের ব্যাপারে একীন রাখা, শুধু আল্লাহ্‌র ওপর তাওয়াক্কুল করা, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি মহব্বত রাখা, ক্বাযা ও ক্বদরে সন্তুষ্ট থাকা,

আল্লাহ্‌র আযাব ও গযবের ভয়, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি ও সওয়াবে আকাঙ্খা এবং আল্লাহ্‌র যাত ও সিফাতের প্রতি ঈমানের ব্যাপারে সমস্ত মু'মিনরা সমানভাবে আদিষ্ট। হযরত উমর (রা) বলেন ঃ হাশরের দিন যদি ঘোষণা দেয়া হয় যে, একজন শুধু বিহিশতে যাবে, তবে আশা করব আমিই হবো ; যদি ঘোষণায় বলা হয় যে, শুধু একজন দোযখে যাবে, তবে ভয় করব যে, হয়তো আমিই হবো। হযরত আলী (রা) বলেন ঃ যদি কেউ কোন পার্থিব বস্তু লাভের আশায় ইবাদত করে, তবে সে ব্যবসায়ী, যদি কেউ ভয়ে শঙ্কিত হয়ে ইবাদত করে, তবে সে দাস ; যদি কেউ কৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য ইবাদত করে, তবে সে আজাদ, স্বাধীন। হাদীসে কুদসীতে এসেছে ঃ আমি তো আমার বান্দার কাছে তার ধারণা অনুযায়ী, তাই সে ধারণা করুক আমার সম্পর্কে যেমন সে চায়।

বর্ণিত আছে, যে শুধু আল্লাহ্‌র মহব্বতের জন্য ইবাদত করে, সে হলো যিনদীক ; যে শুধু তাঁর ভয়ে ইবাদত করে, সে হলো হুরুরী ; যে শুধু তাঁর সওয়াবের আশায় ইবাদত করে, সে হলো মুরজিয়া। আর যে তাঁর মহব্বতে, ভয়ে ও আশায় ইবাদত করে, সে হলো মু'মিন একত্ববাদী।

কর্মের দিক দিয়ে মু'মিনরা উপরোক্ত যাবতীয় ক্ষেত্রে বিভিন্ন হয়ে থাকেন। নির্দেশ পালনের ক্ষেত্র হিসাবে সবাই সমান। কিন্তু আমলের তারতম্যের কারণে মর্যাদার তারতম্য হয়। ইমাম আবূ জা'ফর তাহাবী বলেন ঃ ঈমান তো এক। কিন্তু যারা ঈমানের ধারক তারা তাকওয়ার কারণে, রিপু নিয়ন্ত্রণের কারণে, ইবাদতে নিরবচ্ছিন্নতার কারণে, আল্লাহ্ ভীতির কারণে ও অন্যান্য কারণে মর্যাদার দিক দিয়ে বিভিন্ন হয়ে থাকেন।

৩২. আল্লাহ্ অনুগ্রহশীল, ন্যায়বিচারক

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহশীল। তিনি তাঁর কোন বান্দাকে ইচ্ছা করলে তার প্রাপ্য সওয়াবের চাইতে অনেক বেশি দেন। যেমন আল-কুরআনের ঘোষণা ঃ আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেন। আল্লাহ্ প্রাচুর্যময়, সর্বজ্ঞ। (২ ঃ ২৬১) আবার তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল দেন। তিনি ন্যায়বিচারক। তাই পাপের শাস্তি যতটুকু নির্ধারিত ঠিক ততটুকুই তিনি পাপীকে দেন। একটুও বেশি দেন না। এ হলো তাঁর ইনসাফ। আল কুরআনের ঘোষণা ঃ কেউ কোন ভাল কাজ করলে তার জন্য রয়েছে এর দশগুণ, আর কেউ কোন মন্দকাজ করলে তাকে প্রতিফল দেয়া হবে শুধু সে কাজেরই এবং তাদের ওপর কোন যুলুম করা হবে না। (৬ ঃ ১৬০) অধিক দেওয়া আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ এবং শাস্তি দেওয়া তাঁর ইনসাফ। অধিক দেওয়া বা ক্ষমা করা শাফায়াতের মাধ্যমেও হতে পারে এবং শাফায়াত ছাড়াও হতে পারে। আহমদ, আবূ দাউদ ও ইবন মাজা রিওয়ায়াত

করেন ঃ যদি আল্লাহ্ আসমানবাসী ও যমীনবাসীকে আযাব দেন, তবে এতে তিনি যালিম হবেন না, আর যদি তিনি তাদের রহম করেন, তবে তাঁর এ রহমত হবে তাদের কর্মের চাইতে শ্রেয়।

৩৩. নবীদের শাফায়াত হক

সমস্ত আম্বিয়া ও আমাদের নবী (সা) হাশরের দিন শাফায়াত করবেন। মু'মিনদের মধ্যে যারা ছগীরা গুনাহ্ করে শাস্তির যোগ্য হয়েছে এবং কবীরা গুনাহ করার কারণে যাদের ওপর শাস্তি অবধারিত হয়েছে, এদের সকলের জন্য তাঁরা শাফায়াত করতে পারবেন। আল-কুরআনে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে বলা হয়েছে ঃ আপনি ক্ষমা প্রার্থনা করুন আপনার ও মু'মিন নর-নারীদের গুনাহের জন্য। (৪৭ ঃ ১৯) আরো বলা হয়েছে ঃ কেউ শাফায়াতের অধিকারী হবে না সেদিন তবে সে যে গ্রহণ করেছে দয়াময় আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিশ্রুতি। (১৯ ঃ ৮৭) সেদিন কোন কাজে আসবে না শাফায়াত, তবে তার শাফায়াত কাজে আসবে যাকে অনুমতি দিবেন দয়াময় আল্লাহ্ এবং যার কথা তিনি পছন্দ করবেন। (২০ ঃ ১০৯) যাকে অনুমতি দেওয়া হবে সে ছাড়া অন্য কারো শাফায়াত আল্লাহ্‌র কাছে কোন কাজে আসবে না। (৩৪ ঃ ২৩) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শাফায়াত ও আম্বিয়া (আ)-এর শাফায়াত সম্পর্কে হাদীস গ্রন্থসমূহে অনেক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। আহমদ, আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইবন হাব্বান ও হাকিম আনাস (রা) থেকে ; তিরমিযী, ইবন মাজা, ইবন হাব্বান ও হাকিম জাবির (রা) থেকে ; তিবরানী ইবন আব্বাস (রা) থেকে ; খাতীব ইবন উমর (রা) ও কা'ব ইবন উজরা (রা) থেকে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শাফায়াত সম্পর্কে রিওয়ায়াত করেছেন। রাসূলুল্লাহ্ (সা) শুধু তাঁর গুনাহগার উম্মতকেই শাফায়াত করবেন না, বরং সব নবী রাসূলদের উম্মতদের শাফায়াত করবেন।

৩৪. কিয়ামতের দিন মীযানে আমলের ওজন সত্য

আল-কুরআনে কাফিরদের জন্য ধমকি ও ভীতি প্রদর্শনের যত আয়াত এসেছে মীযান ও ওজন সম্পর্কে তার চাইতে অধিক আয়াত এসেছে। কারণ ওজন ও মীযান মু'মিন ও কাফির উভয়ের জন্য। কুফরীর শাস্তির স্তর ও ঈমানের পুরস্কারের ও মর্যাদার মান নির্ধারণের জন্য এর স্থাপনা। আল-কুরআনে এসেছে ঃ সেদিনের ওজন সত্য, যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই হবে সফলকাম। (৮ ঃ ৮) আর যাদের পাল্লা হালকা হবে তারাই নিজেদের ক্ষতি করেছে, কেননা তারা আমার আয়াতসমূহ প্রত্যাখ্যান করতো। (৭ ঃ ৯) কিয়ামতের দিন আমি স্থাপন করবো ন্যায়বিচারের মানদণ্ড, সুতরাং কোন অবিচার করা হবে না কারো প্রতি এবং কর্ম যদি তিল পরিমাণ ওজনেরও হয় তবুও তা আমি উপস্থিত করবো। হিসাব গ্রহণে আমি যথেষ্ট। (২১ ঃ ৪৭) এ সম্পর্কে আল-কুরআনের ২৩ ঃ ১০২, ১০৩ ; ১০১ ঃ ৬, ৮ দ্রষ্টব্য।

৬—

ইমাম আ'যম (র) বলেন যে, মীযান যেমন সত্য-সঠিক, তেমনি আমলনামাও সত্য এবং আমলনামা পাঠ করাও সত্য। আল কুরআনে এসেছে ঃ তুমি তোমার আমলনামা পাঠ কর, আজ তুমি নিজেই তোমার হিসাব-নিকাশের জন্য যথেষ্ট। (১৭ ঃ ১৪) আর যাকে দেওয়া হবে তার আমলনামা তার ডান হাতে, তার হিসাব-নিকাশ সহজেই নেয়া হবে, এবং সে ফিরবে তার আপনজনদের কাছে প্রফুল্ল চিত্তে। তবে যাকে দেওয়া হবে তার আমলনামা তার পিঠের পেছন দিক থেকে, অবশ্যই সে তার ধ্বংস আহ্বান করবে এবং জ্বলন্ত অগ্নিতে প্রবেশ করবে। (৮৪ ঃ ৭-১২) ইমাম আ'যম (র) মীযানের উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আমলনামা ও হিসাবের উল্লেখ করেননি। কারণ এ দু'টির জন্যই তো মীযান। তাছাড়া যদি হিসাব না থাকবে, মীযান থাকবে কি জন্য ? আর আমলনামা না থাকলে হিসাব হবে কিসের ভিত্তিতে ? তাই মীযান উল্লেখ করে হিসাব ও আমলনামার কথাও এর মধ্যে তিনি বলতে চেয়েছেন ও বলেছেন।

৩৫. হাওযে কাওসার

কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ সুব্হানাহু ওয়া তা'আলা নবী (সা)-কে হাওযে কাওসার দান করবেন। আল-কুরআনের ঘোষণা ঃ নিশ্চয় আমি আপনাকে কাওসার দান করেছি। (১০৮ ঃ ১) কাওসার শব্দের অর্থে তাফসীরকারদের বিভিন্ন মত রয়েছে। কেউ বলেন যে, এর অর্থ হাওয, আবার কারো মতে নহর। তবে আসলে এতে কোন পার্থক্য নেই। মীযান ও পুলসিরাতের কাছে হাশর ময়দানে থাকবে হাওয, আর বিহিশতে থাকবে নহর। তিরমিযী বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কিয়ামতে প্রত্যেক নবীরই হাওয থাকবে। সবাই প্রতিযোগিতা করবে, কার হাওযে বেশি বেশি পানকারীর আগমন ঘটে। আমি আশা করি আমার হাওযে সর্বাধিক পানকারীর আগমন হবে। প্রায় চল্লিশজন সাহাবী হাওয সম্পর্কিত হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তাঁদের বর্ণনা মোতাওয়াতিরের স্তরে উপনীত হয়েছে। হাদীসে হাওয সম্পর্কে বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে।

৩৬. কিয়ামতের দিন যালিম ও মযলুমের মধ্যে কিসাস সত্য

নবী (সা) তাঁর সাহাবীদের জিজ্ঞাস করলেন ঃ বলতে পারো নিঃস্ব কে ? তাঁরা জবাবে বললেন ঃ আমাদের মাঝে তাকে আমরা নিঃস্ব মনে করি, যার অর্থ নেই, সম্পদ নেই, সম্বল নেই। তিনি বললেন ঃ না। প্রকৃত নিঃস্ব সে, যে কিয়ামতের দিন নামায, রোযা ও সাদাকা নিয়ে হাযির হবে। কিন্তু কেউ আসবে তাকে সে গালি দিয়েছিল তার প্রতিকারের দাবী নিয়ে, কেউ আসবে অপবাদের প্রতিকারের দাবি নিয়ে, কেউ আসবে মাল আত্মসাতের দাবি নিয়ে, কেউ আসবে রক্তপাত ও হত্যার দাবি নিয়ে, কেউ আসবে আঘাতের দাবি নিয়ে, ইত্যাকার আরো আরো। এদের

প্রত্যেককে তার নেক আমল থেকে দিয়ে বিদায় করা হবে। যখন তার নেক আমল শেষ হয়ে যাবে তখন ওদের গুনাহ তার ওপর বর্তানো হবে এবং পরে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। বান্দার হক আদায় করতেই হবে--এ পৃথিবীতে অথবা আখিরাতে। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ কেউ যদি তার ভাইয়ের ওপর কোন যুলুম করে থাকে, সে যেন এক্ষুণই তার প্রতিকার করে, তার অর্থ সম্পদ থাকবে না যখন তখনকার অপেক্ষা না করে। সেদিন যদি তার নেক আমল থাকে, তবে যুলম অনুপাতে তা দিয়ে দেয়া হবে। আর যদি না থাকে, তবে প্রতিবাদীর গুনাহ তার ওপর যুলম অনুপাতে বর্তানো হবে। সে এ বোঝা বহন করবে।

৩৭. বিহিশত ও দোযখ বর্তমানে সৃষ্ট, কখনো লয় হবার নয়

বিহিশত ও দোযখ হক। এ দু'টি আল্লাহ্ তা'আলা তৈরি করে রেখেছেন। এর অধিবাসীসহ এরা চির বিদ্যমান। যেমন বিহিশত সম্পর্কে আল কুরআনের ঘোষণা ঃ যারা ঈমান আনল ও নেক আমল করল, তাঁরা বিহিশতের অধিবাসী, তাঁরা সেথায় চিরকাল স্থায়ীভাবে থাকবে। (২ ঃ ৮১) দোযখ সম্বন্ধে আল কুরআনের ঘোষণা ঃ যারা কুফরী করল ও আমার আয়াতসমূহ অস্বীকার করল, তারা দোযখের বাসিন্দা, তারা সেথায় চিরকাল স্থায়ীভাবে থাকবে। (২ ঃ ২৫) আল কুরআনে এ ধরনের বহু আয়াত আছে। বিহিশতবাসীদের তথায় থাকবে আয়তলোচনা হুরকুল। যেমন বিহিশতবাসীরা বিহিশতে প্রবেশের পর স্থায়ী হবেন, মারা যাবেন না, ঠিক তেমনি হুররাও মরবেন না। আল কুরআনে চারবার হুরদের কথা উল্লেখিত হয়েছে ঃ ৪৪ ঃ ৫৮ ; ৫২ ঃ ২০ ; ৫৫ ঃ ৭২ ও ৫৬ ঃ ২২।

এখানে ইমাম আ'যম সিরাতের কথা উল্লেখ করেননি। ব্যাখ্যাকাররা বলেছেন যে, জান্নাত ও জাহান্নামের পূর্বেই পুলসিরাতের বর্ণনা। আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ তোমাদের মাঝে কেউই নেই, যে তা অতিক্রম করবে না। এ হলো তোমার রবের অনিবার্য সিদ্ধান্ত। (১৯ ঃ ৭১) অধিকাংশ তাফসীরকারদের মতে এর অর্থ পুলসিরাত অতিক্রম করা। হযরত ইবন আব্বাস (রা) থেকে এরূপ রিওয়ায়াত বর্ণিত হয়েছে। সহীহ মুসলিমে পুলসিরাত সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে ঃ জাহান্নামের ওপর একটি দীর্ঘ সেতু হলো পুলসিরাত, যা চুলের চাইতে সূক্ষ্ম ও তরবারীর চাইতে ধারাল। আর এক বর্ণনায় রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ পুলসিরাত জাহান্নামের দু'প্রান্ত সংযুক্ত সেতু এবং সব রাসূলদের মধ্যে আমিই সর্বপ্রথম উম্মতদের নিয়ে তা অতিক্রম করব। হযরত জাবির (রা) নবী (সা) থেকে বর্ণনা করেন ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে উক্ত আয়াত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, অতিক্রম করা অর্থ প্রবেশ করা। কোন নেককার অথবা বদকার এমন থাকবে না যে, সে সেখানে প্রবেশ করবে না। মু'মিনের জন্য তা শীতল ও শান্তিদায়ক হবে যেমন হয়েছিল ইবরাহীম (আ)-এর জন্য।

হাশর ময়দানে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কথা বলবে, এটিও একটি আকীদার বিষয়। আল কুরআনের ঘোষণা ঃ যেদিন সাক্ষ্য দিবে তাদের বিরুদ্ধে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত ও তাদের পা তাদের কৃত কর্ম সম্বন্ধে, সেদিন আল্লাহ্ তাদের প্রতিফল পুরোপুরি দিবেন এবং তারা জানবে যে, আল্লাহ্ই সত্য, স্পষ্ট প্রকাশকারী। (২৪ ঃ ২৪, ২৫) পরিশেষে যখন তারা জাহান্নামের কাছে পৌছবে তখন তাদের কান, তাদের চোখ ও তাদের চামড়া তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবে। (৪১ ঃ ২০) জাহান্নামীরা তাদের চামড়াকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছ কেন ? চামড়া উত্তরে বলবে, আল্লাহ্ যিনি সবকিছুকে বাকশক্তি দিয়েছেন, তিনিই আমাদের বাকশক্তি দিয়েছেন। (৪১ ঃ ২১)

৩৮. হিদায়াত দান করা আল্লাহ্র অনুগ্রহ এবং পরিত্যাগ করা তাঁর ইনসাফ

আল-কুরআনের ঘোষণা ঃ আল্লাহ্ কাউকে হিদায়াত দান করতে চাইলে তিনি তার বক্ষ ইসলামের জন্য প্রশস্ত করে দেন আর কাউকে বিপথগামী করতে চাইলে তিনি তার বক্ষ অতিশয় সংকীর্ণ করে দেন, তার কাছে ইসলাম অনুসরণ করা আকাশে আরোহণের মতই দুঃসাধ্য হয়ে পড়ে। যারা ঈমান আনে না আল্লাহ্ তাদের এরূপই লাঞ্ছিত করেন। (৬ ঃ ১২৫) কাউকে বিপথগামী করার প্রকৃত অর্থ তাকে পরিত্যাগ করা। তার ইচ্ছায় সে আল্লাহ্র সন্তুষ্টি চায় না, তাই তিনি তাকে তাঁর রহমত থেকে দূরে রাখেন, তাকে হিদায়াত দান করেন না। তাকে শাস্তি দেয়া তাঁর ইনসাফ। কারণ সে স্বেচ্ছায় যা কামনা করেছে আল্লাহ্ তাকে তা করার তওফীক দিয়েছেন। তার কর্ম অনুযায়ী প্রতিফল পাওয়া তার প্রাপ্য। আল্লাহ্ তাকে যে শাস্তি দেন তা তার প্রাপ্য। আর এ হলো তাঁর ইনসাফ। কিন্তু যাকে হিদায়াত দেন তা তিনি করেন স্বীয় করুণায়, স্বীয় অনুগ্রহে।

৩৯. শয়তান জোরপূর্বক বান্দার ঈমান ছিনিয়ে নেয় না

আল কুরআনের ঘোষণা ঃ আমার বান্দাদের ওপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই তবে সেসব গোমরাহদের ছাড়া, যারা তোমার অনুসরণ করবে। (১৫ ঃ ৪২) শয়তানের কোন আধিপত্য নেই তাদের ওপর, যারা ঈমান আনে এবং তাদের রবের ওপর তাওয়াক্কুল করে। তবে তার আধিপত্য তো কেবল তাদের ওপর, যারা তাকে অভিভাবকরূপে গ্রহণ করে আর আল্লাহ্র সঙ্গে শরীক করে। (১৬ ঃ ৯৯, ১০০) শয়তান বলল ঃ বলুন, কেন আপনি আদমকে আমার ওপর মর্যাদা দিলেন ? কিয়ামতের দিন পর্যন্ত যদি আমাকে অবকাশ দেন, তাহলে আমি অল্প কতক ছাড়া তার বংশধরদের কর্তৃত্বাধীন করে ফেলব। আল্লাহ্ বললেন ঃ যাও, তাদের মধ্যে যারা তোমার অনুসরণ করবে, তোমাদের পরিপূর্ণ শাস্তি হবে জাহান্নাম। তোমার ডাকে তাদের মধ্যে যাকে পার পদস্খলিত কর, তোমার অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী দিয়ে তাদের আক্রমণ

কর এবং তাদের সম্পদে ও সন্তানে শরীক হয়ে যাও আর প্রতিশ্রুতি দাও তাদের। যে প্রতিশ্রুতি শয়তান তাদের দেয় তা ছলনামাত্র। আমার বান্দাদের ওপর তোমার কোন ক্ষমতা নেই। (১৭ ঃ ৬২-৬৫)

মানুষের ওপর শয়তানের কোন কর্তৃত্ব বা ক্ষমতা নেই। যখন সে স্বেচ্ছায় তার দিকে অগ্রসর হয়, আল্লাহ্‌র পথ ছেড়ে দিতে চায়, হোক তা তার প্রবৃত্তির কারণে অথবা শয়তানের প্ররোচনায়, তখন শয়তান তার ওপর প্রভাব বিস্তার করে ঈমানের পরিমণ্ডল থেকে তাকে বের করে নেয়।

৪০. কবর, মুনকার ও নকীর, কবর আযাব ইত্যাদি

মানুষের দুনিয়ার জীবনের পর আখিরাতের জীবন। আখিরাতের জীবনের জন্য মৃত্যু অবধারিত। মৃত্যুর পর আখিরাতের জীবন লাভের পূর্ব পর্যন্ত সময় কবরের জীবন। তা যে অবস্থায় হোকনা কেন। কবরের জীবনে সংকোচন, মুনকার ও নাকীরের প্রশ্ন, সওয়াব ও আযাবের আস্বাদন ইত্যাদির ওপর বিশ্বাস স্থাপন আকীদার বিষয়। আল-কুরআনের ঘোষণা ঃ কিয়ামত অবশ্যম্ভাবী, এতে কোন সন্দেহ নেই এবং যারা কবরে রয়েছে নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদের জীবিত করে উঠাবেন। (২২ ঃ ৭) যখন কবর উন্মোচিত করা হবে, তখন প্রত্যেকে জানবে, সে কী অগ্রে পাঠিয়েছে আর কী পেছনে রেখে গেছে। (৮২ ঃ ৪ ও ৫) তবে কি সে জানেনা যখন কবরে যা আছে তা উত্থিত হবে এবং অন্তরে যা আছে তা প্রকাশ করা হবে। (১০০ ঃ ৯ ও ১০) এ ধরনের আয়াতে কবর সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে।

কবরের অবস্থা সম্পর্কে আল-কুরআনের বর্ণনা ঃ যখন তাদের কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে, হে আমার রব! আমাকে পৃথিবীতে পুনরায় প্রেরণ করুন, যাতে আমি করতে পারি ভাল কাজ যা আগে করিনি। কক্ষনো এরূপ হবার নয়। এতো তার মুখের উক্তি। তাদের জন্য রয়েছে বারযাখ, যেখানে তারা থাকবে পুনরায় জীবিত হয়ে উঠার দিন পর্যন্ত। (২৩ ঃ ৯৯ ও ১০০) তাদের সকাল-সন্ধ্যায় উপস্থিত করা হয় আগুনের সামনে এবং যেদিন কিয়ামত ঘটবে সেদিন বলা হবে—ফিরআউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিন শাস্তিতে। (৪০ ঃ ৪৬) এখানে ফিরআউনকে ও তার লোকজনদের কিয়ামতের পূর্বেই সকাল-সন্ধ্যায় দোযখের আগুনের শাস্তির কথা বলা হয়েছে। এবং এ শাস্তি হবে রূহের ওপর। এ সম্পর্কে আল কুরআনের ঘোষণা ঃ গুরুতর শাস্তির পূর্বে আমি অবশ্যই তাদের লঘু শাস্তি আস্বাদন করাব। (৩২ ঃ ২১) এখানে 'আযাবে আকবর' দ্বারা দোযখের আযাব এবং 'আযাবে আদনা' দ্বারা কবরের আযাব বুঝান হয়েছে। কবরে মুনকার ও নাকীর প্রশ্ন করবে ঃ তোমার রব কে ? তোমার দীন কি ? তোমার নবী কে ? তবে নবীদের, শহীদদের ও শিশুদের প্রশ্ন করা হবে না। ইমাম আ'যম (র)-কে কাফিরদের শিশুদের সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে,

তারা বিহিশতে যাবে কিনা এবং তাদের মুনকার ও নাকীর প্রশ্ন করবে কি না। জবাবে তিনি নীরবতা অবলম্বন করেন। তারা বিহিশতে খাদেমের ভূমিকা পালন করবে এ কথা বলেন।

কবরে দেহে রূহ ফিরিয়ে আনা হবে। দেহ পরিপূর্ণ হতে পারে, আংশিক হতে পারে। একত্রিত হতে পারে অথবা নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত হতে পারে। মু'মিনরা বলবে ঃ আমাদের রব আল্লাহ্, আমাদের দীন ইসলাম এবং আমাদের নবী মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)। আর কাফিররা বলবে ঃ হায়, হায়! জানি না। বুখারী, মুসলিম, আবূ দাউদ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

কবরের সংকোচন সত্য - কামিল মু'মিনও এর থেকে পরিত্রাণ পাবে না। রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেছেন ঃ যদি কেউ কবরের সংকোচন থেকে রেহাই পেতো, তাহলে সা'দ ইবন মু'য়ায পেতো, যার মৃত্যুতে আল্লাহ্‌র আরশ কেঁপে উঠেছিল। তবে মু'মিনের ওপর কবরের সংকোচন সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তা হবে দীর্ঘ সফর থেকে ফিরে আসা সন্তানের সঙ্গে স্নেহময়ী মায়ের কোলাকুলীর মত। হযরত আয়েশা (রা)-কে রাসূলুল্লাহ্ (সা) বলেন ঃ শোন, কবরের সংকোচন মু'মিনের জন্য সন্তানের পায়ে মায়ের চুমোর মত এবং মুনকার ও নাকীরের প্রশ্ন চোখ উঠলে তাতে সুরমা লাগানোর মত। একবার রাসূলুল্লাহ্ (সা) হযরত উমর (রা)-কে জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তোমার কাছে যখন কবরে মুনকার ও নাকীর আসবে তখন তোমার অবস্থা কেমন হবে? হযরত উমর (রা) জানতে চাইলেন ঃ তখন কি আমার এখন যে অবস্থা ও এখন যে জ্ঞান আছে, তা থাকবে? রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ হাঁ! হযরত উমর বললেন ঃ তাহলে কোনরূপ ভয় করি না।

৪১. আল্লাহ্‌র সিফাতের ভাষান্তর বৈধ তবে يد এর নয়। তাঁর নৈকট্য ও দূরত্ব

যে সমস্ত গুণাবলী ও নাম আল কুরআনে আল্লাহ্‌র জন্য উল্লেখিত হয়েছে, সেসব ভাষায় অনুবাদ করে প্রকাশ করা বৈধ। তবে আল্লাহ্‌র সিফাত যেখানে يد এসেছে তার অনুবাদ জায়িয নয়। আল্লাহ্‌র অন্যান্য সিফাত যেমন وجه (চেহারা), قدم (পা) ইত্যাদি কোন সাদৃশ্য ও তুলনা ব্যতিরেকে ভাষান্তরিত করে ব্যবহার করায় কোন মানা নেই। আল্লাহ্‌র নৈকট্য ও দূরত্ব কোন পরিমাপের মানদণ্ডে বিবেচনা করা যাবে না। যেমন দানশীল ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী ও কৃপণ ব্যক্তি আল্লাহ্ থেকে দূরে। এ নিকটবর্তীতা ও দূরবর্তীতার কোন ধরন ও প্রকৃতি জানা নেই। যখন-আল কুরআনে বলা হয় ঃ আল্লাহ্‌র রহমত নেক বান্দাদের নিকটবর্তী। (৭ ঃ ৫৬) তখন বুঝতে হবে যে, সে বদকারদের থেকে দূরে। তাই যারা তাঁর অনুগত তারা তাঁর নিকটবর্তী আর যারা তাঁর অবাধ্য ও নাফরমান তারা তাঁর থেকে দূরে। মানুষ নিকট ও দূর বলতে সাধারণত : যা বুঝে, এক্ষেত্রে তা নয়। এসব অভিব্যক্তি বান্দার আকুতি ও ব্যাকুলতা

প্রকাশের জন্য। যেমন আল-কুরআনে বলা হয়েছে ঃ সিজদা কর ও আমার নিকটবর্তী হও। (৯৬ ঃ ১৯) অর্থাৎ আল্লাহ্‌কে সিজদা কর, তাঁর অনুগত হও, তাহলে তাঁর নৈকট্য লাভ করতে পারবে। তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনে সক্ষম হবে।

বিহিশতে আল্লাহ্‌র নিকটবর্তী হওয়া, কিয়ামতে তাঁর কাছে অবস্থান, ঘাড়ের রগের চাইতেও বান্দার নিকটবর্তী হওয়া সবই সত্য, তবে কেমন হবে তা এবং কি ধরনের হবে তা জানা নেই। আল-কুরআনের ঘোষণা ঃ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র সম্মুখে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে, তার জন্য রয়েছে দু'টি উদ্যান। (৫৫ ঃ ৪৬) তবে যে তার রবের সামনে দাঁড়াতে ভয় রাখে, নিবৃত্ত রাখে নিজেকে প্রবৃত্তি থেকে, জান্নাতই হবে আবাসস্থল তার। (৭৯ ঃ ৪০, ৪১) আমিই সৃষ্টি করেছি মানুষ এবং আমি জানি কি কুমন্ত্রণা দেয় তার প্রবৃত্তি তাকে, আর আমি তার নিকটতর তার ঘাড়ের রগের চাইতে। (৫০ ঃ ১৬) আল্লাহ্‌র নৈকট্য বান্দার প্রতি এবং বান্দার নৈকট্য আল্লাহ্‌র প্রতি এমন কথা, যার ধরন ও প্রকৃতি ধারণাতীত। তবে অধিকাংশের মতে বান্দার প্রতি আল্লাহ্‌র নৈকট্যের দ্বারা বান্দার আনুগত্যের কারণে তার প্রতি আল্লাহ্‌র রহমত বুঝায়। আবার তাঁর নাফরমানীর কারণে যখন তাঁর নিয়ামত ও তওফীক বান্দার থেকে তুলে নেয়া হয়, তখন তা দূরত্বের অর্থে ব্যবহৃত হয়। অনেকে আবার নৈকট্য ও দূরত্বকে এক্ষেত্রে যথাক্রমে মর্যাদা ও অপমানের অর্থে বুঝাতে চেয়েছেন।

৪২. আল-কুরআনের মর্যাদা

আল-কুরআন আল্লাহ্‌র তরফ থেকে মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ওপর নাযিল হয়েছে, যা অক্ষরের অবয়বে মাসহাফে লিপিবদ্ধ। দীর্ঘ ২৩ বছর ধরে এ কুরআন অবতীর্ণ হয়। অর্থের দিক দিয়ে কুরআনের সমস্ত আয়াত মর্যাদায় সমান। আল্লাহ্‌র রহমতের কথা কিংবা তাঁর গযবের বর্ণনা, তাঁর সন্তোষভাজনদের উল্লেখ কিংবা তাঁর দুশমনদের কথা, তাঁর সিফাত কিংবা বিধি-বিধানের কথা সবকিছুই বাক্য ও মর্মের দিক দিয়ে সম মর্যাদাসম্পন্ন। তবে কোন কোন আয়াতের মধ্যে বর্ণিত বিষয়ের মর্যাদার কারণে তার মর্যাদা দ্বিগুণ হয়ে যায়। যেমন আয়াতুল কুরসী, সূরা ইখলাস প্রভৃতি। এতো আল্লাহ্‌র কালাম। এদিক দিয়ে এর মর্যাদা অন্যান্য আয়াতের সমান। যেহেতু এতে মহামহিম আল্লাহ্‌র যাত সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে, তাই বর্ণিত বিষয়ের মর্যাদার কারণে এর মর্যাদা অন্যান্য আয়াতের মর্যাদার চাইতে অনেক বেশি। যেমন সূরা লাহাবে আবূ লাহাবের কথা আছে। এ কারণে আয়াত হিসাবে এর মর্যাদা অন্যান্য আয়াতের সমান। তবে যেহেতু আবূ লাহাব কাফির হওয়ার কারণে তার কোন বৈশিষ্ট্য নেই, নেই কোন শ্রেষ্ঠত্ব, তাই এ আয়াতেরও কোন ফযীলত অন্য আয়াতের ওপরে নেই। কিন্তু আল্লাহ্‌র বাণী হওয়ার কারণে এ আয়াতসমূহ তাঁর অন্যান্য বাণীর সম মর্যাদাসম্পন্ন।

৪৩. আল্লাহ্‌র নাম ও সিফাত সমান

আল-কুরআনে আল্লাহ্‌র যেসব নাম যেমন আল্লাহ্‌, আহাদ, সামাদ, মালিক, ওয়াহিদ, ফরদ ইত্যাদি এবং সিফাত যেমন লাহুল মুলক, লাহুল হামদ, লাহুল কিবরিয়াউ, লাহুল মাজদ ইত্যাদি রয়েছে, তা সবই বর্ণনায় ও মর্যাদায় সমান। এসবের মধ্যে আল্লাহ্‌র নাম ও সিফাত হওয়ার দিক দিয়ে কোন পার্থক্য নেই। প্রয়োগের ক্ষেত্রে এসব নাম ও সিফাত সম্পূর্ণ সমান। তবে হাদীসে ইসমে আ'যম সম্পর্কে যে বর্ণনা রয়েছে, তা এ ক্ষেত্রে কোন ব্যত্যয় ঘটাবে না। কারণ সেখানে কোন কোন নাম ও সিফাতকে আ'যম বা অধিক মহান হওয়ার কথা বলা হয়েছে। আল্লাহ্‌র নাম হিসাবে সে সব সমান, তবে অন্য কারণে অধিক মহান।

ইমাম আবূ হানীফা (রা) থেকে হাকিম তার 'আল মুনতাকা' গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন ঃ কারো জন্য তার স্রষ্টা সম্পর্কে অজ্ঞতা ওযর বা কৈফিয়ত হতে পারে না যখন সে প্রত্যক্ষ করে আসমান ও যমীন সৃষ্টি ও তার নিজের সৃষ্টির প্রতি। তাই যদি আল্লাহ্‌ তা'আলা কোন নবী না পাঠাতেন তবুও তাঁর পরিচিতি বান্দাদের জ্ঞানের কারণে তাদের ওপর ওয়াজিব ছিল। বিবেকের কারণে ভাল-মন্দ বিচার করা ও সে অনুযায়ী কাজ করা স্বাভাবিক। এজন্য নবী প্রেরণের প্রয়োজন নেই। তাই কারো কাছে নবী বা তার বাণী ও শিক্ষা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে না পৌঁছলে, যে ব্যাপারে তার জ্ঞান ও বিবেক তাকে নির্দেশ দেয়নি, সে ব্যাপারে সে জিজ্ঞাসিত হবে না। আল-কুরআনের ঘোষণা ঃ আমি রাসূল না পাঠান পর্যন্ত কাউকে শাস্তি দেই না। (১৭ ঃ ১৫) যে বোঝা সে বইতে অক্ষম, তা কখনো তার ওপর চাপানো হবে না। এজন্য আল বাকারার ২৮৬ আয়াতে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ্‌ কারো ওপর এমন কোন দুর্বহ বোঝা বহনের দায়িত্ব অর্পণ করেন না, যা সে বইতে পারে না। সে যা কিছু ভাল উপার্জন করে তা তার জন্য এবং সে যা কিছু মন্দ উপার্জন করে তাও তারই।

এরপর বান্দাদের শিখিয়ে দেওয়া হয়েছে তাঁর কাছে প্রার্থনা করতে ঃ হে আমাদের রব! পাকড়াও করবেন না আমাদের যদি আমরা ভুলে যাই অথবা ভুল করি। হে আমাদের রব! চাপাবেন না আমাদের ওপর এমন গুরুভার যেমন চাপিয়েছিলেন আমাদের পূর্ববর্তীদের ওপর। হে আমাদের রব! অর্পণ করবেন না আমাদের ওপর এমন বোঝা, যা বহন করার শক্তি আমাদের নেই। আমাদের পাপ মোচন করুন, আমাদের ক্ষমা করুন, আমাদের প্রতি দয়া করুন। আপনিই আমাদের অভিভাবক, সুতরাং জয়ী করুন আমাদের সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের বিরুদ্ধে। (২ ঃ ২৮৬)

দুনিয়ায় বিহিশতী বলে সাক্ষ্য দেয়ার ব্যাপারে তিনটি মত রয়েছে ঃ

১. সব নবী-রাসূলরা জান্নাতী। এটি সর্ববাদী সম্মত অভিমত।

২. যাদের সম্বন্ধে কুরআন অথবা হাদীসে বর্ণনা এসেছে। যেমন-আশারায়ে মুবাশ্বারা। এটি অধিকাংশ ইমামদের মত। কেননা যে দশজন সাহাবী সম্পর্কে বিহিশতের খোশ-খবর দেয়া হয়েছে তারা সব সময় ভীত-শঙ্কিত থাকতেন, পাছে না যেন তাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়ে যায়।

৩. যাদের সম্বন্ধে মু'মিনরা জান্নাতী হওয়ার সাক্ষ্য দেয়। যেমন-রাসূলুল্লাহ্ (সা) একবার এক জানাযার সম্মুখীন হলে সবাই তার প্রশংসা করেন, তিনি দোয়া করলেন এবং বললেন, এর জন্য জান্নাত অবধারিত।

৪৪. আবু তালিব কাফির অবস্থায় মারা যান

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা এবং ইসলামের চতুর্থ খলীফা হযরত আলী (রা)-এর পিতা যিনি সারা জীবন রাসূলুল্লাহ্ (সা)-কে সব নির্যাতন ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে সহায়তা করেছিলেন, তিনি ইসলামে প্রকাশ্যভাবে দাখিল না হওয়ায় কাফির অবস্থায় মারা যান। যখন তার ওফাতের সময় উপস্থিত, তখন তার কাছে রাসূলুল্লাহ্ (সা) যান। সেখানে তিনি আবূ জাহেলকে দেখতে পান। তিনি তাঁর চাচাকে বলেন ঃ আপনি এ বাক্যটি উচ্চারণ করুন, আমি এর দরুণ আপনার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে দলীল পেশ করব। আবূ জাহল বারবার বলতে লাগল, তুমি কি তাকে আবদুল মুত্তালিবের ধর্ম থেকে দূরে সরিয়ে নিতে প্ররোচিত করছো ? পরিশেষে আবূ তালিব লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলতে অস্বীকৃতি জানাল এবং বলল যে, আমি আবদুল মুত্তালিবের ধর্মে যাচ্ছি। তখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) বললেন ঃ আমি অবশ্যই আপনার জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা চাইব। তখন আয়াত নাযিল হল ঃ নবীর জন্য এবং মু'মিনদের জন্য সংগত নয় যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করবে মুশরিকদের জন্য, যদিও তারা হয় নিকট আত্মীয়, একথা সুস্পষ্ট হয়ে যাওয়ার পর যে, তারা তো জাহান্নামী। (৯ ঃ ১১৩)

যখন রাসূলুল্লাহ্ (সা) আবূ তালিবকে ইসলাম গ্রহণের জন্য অনুরোধ করছিলেন এবং সে তা অস্বীকার করে তখন আয়াত নাযিল হয় ঃ আপনি তো হিদায়াতের দিকে আনতে পারবেন না তাকে যাকে আপনি ভালবাসেন, তবে আল্লাহ্‌ই হিদায়াত দেন যাকে ইচ্ছা করেন এবং তিনিই ভাল জানেন সৎপথ অনুসারীদের। (২৮ ঃ ৫৬) বুখারী, মুসলিম।

৪৫. রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের আওলাদ

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তিন পুত্র ও চার কন্যা ছিল। কাসিম, আবদুল্লাহ্ ও ইবরাহীম তিন পুত্র এবং যয়নব, রুকাইয়া, উম্ম কুলসুম ও ফাতিমা চার কন্যা। এদের মধ্যে ইবরাহীম ছাড়া সকলেই হযরত খাদীজার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন এবং

মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। শুধু ইবরাহীম মদীনায় হযরত মারিয়া কিবতিয়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।

কাসিম (রা) ঃ নবুওয়াতের পূর্বে হযরত খাদীজার গর্ভে কাসিমের জন্ম। প্রথম সন্তানের কারণে রাসূলুল্লাহ্ আবুল কাসিম নামে খ্যাত। শিশুকালেই তাঁর মৃত্যু হয়। সতের মাস কিংবা দুই বছর তিনি বেঁচে ছিলেন। নবুওয়াত লাভের পূর্বেই তাঁর ইন্তিকাল হয়।

আবদুল্লাহ্ (রা) ঃ নবুওয়াত লাভের পর তার জন্ম। তাই তাঁকে তাহির ও তাইয়্যিবও বলা হতো। তিনিও শিশুকালে ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালে কাফিররা উৎফুল্ল হয়ে বলেছিল ঃ সে তো নির্বংশ। তাদের ধারণা ছিল যে, তাঁরপর তাঁর প্রচারিত দীনও তাঁর বংশের মত শেষ হয়ে যায়। তখন আল-কুরআনের ১০৮ নং সূরা আল-কাওসার নাযিল হয়। কারো কারো মতে এ ঘটনা ইবরাহীম অথবা কাসিমের ইন্তিকালের পর ঘটেছিল।

ইবরাহীম (রা) ঃ মদীনায় ৮ম হিজরীতে মারিয়া কিবতিয়া (রা)-এর গর্ভে তাঁর জন্ম। তিনিই রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সর্বশেষ সন্তান। জন্মের ৭দিন পর দুটি ভেড়া যবেহ করে তাঁর আকীকা করেন। মাথার চুল দাফন করিয়েছেন ও চুলের ওযন পরিমাণ রৌপ্য সাদকা করেন। হযরত আবূ হিন্দ বায়াযি (রা) তাঁর মাথা মুণ্ডন করেন। ১০ম হিজরী ১০ রবিউল আউয়ালে ১৬ মাস বয়সে, মতান্তরে ১৮ মাস বয়সে, তিনি ইন্তিকাল করেন।

যয়নব (রা) ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর শাদী মোবারকের ৫ বছর পর ৩০ বছর বয়সে হযরত খাদীজা (রা)-এর গর্ভে তাঁর জন্ম। তিনি ইসলাম গ্রহণ করেন এবং আপন খালাত ভাই আবুল আস ইবন রাবী'র সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। ৮ম হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। আলী ও উসামাহ নামে তাঁর এক পুত্র ও এক কন্যা জন্মগ্রহণ করে। মক্কা বিজয়ের দিন আলী (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর সঙ্গে উটের ওপর সওয়ার ছিলেন। তিনি তাঁর মাতার ইন্তিকালের পর রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর জীবদ্দশায়ই ইন্তিকাল করেন। উসামাহ (রা) ৫০ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। ফাতিমা (রা)-এর ইন্তিকালের পর হযরত আলী (রা) তাঁকে বিয়ে করেন। হযরত আলী (রা)-এর ঘরে তাঁর কোন সন্তান জন্মগ্রহণ করেনি। হযরত আলী (রা)-এর ইন্তিকালের পর মুগীরা ইবন নওফেলের (রা) সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। তাঁর কোন সন্তান ছিল না।

রুকাইয়্যা (রা) ঃ রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর ৩৩ বছর বয়সে খাদীজা (রা)-এর গর্ভে তাঁর জন্ম। রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চাচা আবূ লাহাবের পুত্র ওতবার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। আল-কুরআনের ১১১নং সূরা লাহাব নাযিল হলে আবূ লাহাব তাকে ও তার ভাই

ওতাইবাকে, যার সঙ্গে রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর তৃতীয়া কন্যা উম্মু কুলসুমের শাদী হয়েছিল, বলেছিল ঃ তোমাদের সাথে আমার দেখা-সাক্ষাৎ হারাম যতক্ষণ না তোমরা মুহাম্মদের কন্যাদ্বয়কে তালাক দাও। এতে তারা উভয়ই তালাক দিয়ে দেয়। তাদের এ বিয়ে বাল্যকালে হয়েছিল, এমন কি তাদের বাসর ঘরেরও সুযোগ হয়নি। যদিও মক্কা বিজয়ের পর ওতবা ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন, তবুও যেহেতু আগেই হযরত উসমান (রা)-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়ে গিয়েছিল, তাই তার আর কোন দাবি ছিল না। হযরত রুকাইয়্যা (রা) প্রথমে হাবশায় ও পরে মদীনায় হিজরত করেন। বদর যুদ্ধের সময় তিনি অসুস্থ থাকায় হুযুর (সা) হযরত উসমান (রা)-কে তাঁর শুশ্রূষার জন্য রেখে যান। যখন বদর যুদ্ধের বিজয় খবর মদীনায় পৌঁছে তখন হযরত রুকাইয়্যার দাফন সম্পন্ন হয়। হাবশায় হিজরতকালীন অবস্থায় তাঁর আবদুল্লাহ্ নামে একপুত্রের জন্ম হয়, যিনি ৪র্থ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।

উম্মু কুলসুম (রা) ঃ হুযুর (সা)-এর তৃতীয়া কন্যা মক্কায় জন্ম গ্রহণ করেন। আবূ লাহাবের পুত্র ওতবার সঙ্গে বাল্যকালে বিয়ে হয়। রুখছতি ও বাসর ঘর সম্পন্ন হওয়ার আগেই পিতার নির্দেশে ওতাইবা তালাক দিয়ে দেয়। তৃতীয় হিজরীতে উসমান (রা)-এর সঙ্গে তাঁর পুনরায় বিয়ে হয়। রুকাইয়্যা (রা)-এর মৃত্যুর পর হযরত উমর তাঁর কন্যা হাফসাকে উসমান (রা)-এর সঙ্গে বিয়ের প্রস্তাব দিলে তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। এতে হযরত উমর (রা) দারুণ ব্যথা পান। একথা রাসূলুল্লাহ্ (সা) জানতে পেরে উমর (রা)-কে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে উসমানের চাইতে উত্তম এবং উসমানকে তোমার চাইতে উত্তমের সন্ধান দিব ? হযরত উমর (রা) বললেন ঃ অবশ্যই, হে আল্লাহ্র রাসূল! তখন তিনি বললেন ঃ তোমার কন্যাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দাও এবং আমার কন্যাকে উসমানের সঙ্গে বিয়ে দেই।

হযরত উসমান (রা)-এর ঘরে তাঁর কোন সন্তান জন্ম গ্রহণ করেনি। ৯ম হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর হুযূর (সা) বলেন ঃ যদি আমার একশত কন্যা থাকত এবং একের পর এক মারা যেতো, তা এভাবেই আমি একের পর এক উসমানের সঙ্গে বিয়ে দিতাম।

ফাতিমা (রা) ঃ আজযাহ্রা, আলবতুল, সাইয়্যেদাতু আহলিল জান্নাত ও সাইয়্যেদাতু নিসায়িল মু'মিনীন তাঁর খিতাব। তিনি রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর চতুর্থ কন্যা। এবং সমস্ত কন্যাদের মধ্যে তিনি বয়সের দিক দিয়ে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। নবুওয়াতের ১ বছর পর, ভিন্ন মতে ৫ বছর পূর্বে মক্কায় জন্মগ্রহণ করেন। হিজরতের দু'বছর পর হযরত আলী (রা)-এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। বিয়ের ৭ মাস ১৫দিন পর রুখছতী হয়। তখন তাঁর বয়স ছিল ১৫ বছর ৫ মাস। এবং আলী (রা)-এর বয়স ছিল ২১ বছর পাঁচ মাস ভিন্ন

মতে ২৪ বছর দেড় মাস। হযরত ফাতিমা (রা)-এর জীবদ্দশায় হযরত আলী (রা) অন্য কোন বিয়ে করেননি। একবার তিনি আবূ জাহলের কন্যাকে দ্বিতীয় বিয়ে করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে হযরত ফাতিমা (রা) হুযূর (সা)-এর কাছে অভিযোগ করেন। হুযূর (সা) বললেন ঃ ফাতিমা আমার কলিজার টুকরা, যে তাঁর মনে কষ্ট দিল সে যেন আমার মনে কষ্ট দিল। একথা শুনে হযরত আলী (রা) তাঁর জীবিত থাকাকালীন সময়ে দ্বিতীয় বিয়ে করেননি। হুযূর (সা)-এর ইন্তিকালের ৬ মাস পর হযরত ফাতিমা (রা) ইন্তিকাল করেন।

তাঁর তিন পুত্র ও তিন কন্যা ছিল। বিয়ের দ্বিতীয় বছর হযরত হাসান (রা), তৃতীয় বছর হযরত হুসাইন (রা) ও চতুর্থ বছর হযরত মুহসিন (রা) জন্মগ্রহণ করেন। মুহসিন (রা) শৈশবেই ইন্তিকাল করেন। কন্যাদের মধ্যে হযরত রুকাইয়্যা বাল্যকালেই ইন্তিকাল করেন। দ্বিতীয় কন্যা হযরত উম্মু কুলসুম (রা)-এর প্রথম বিয়ে দ্বিতীয় খলীফা হযরত উমর (রা)-এর সঙ্গে হয়। এ বিয়েতে একপুত্র যায়েদ (রা) ও এক কন্যা রুকাইয়্যা জন্মগ্রহণ করেন। হযরত উমর (রা)-এর ইন্তিকালের পর তাঁর বিয়ে হযরত আউন বিন জা'ফর (রা)-এর সঙ্গে হয়। এ বিয়েতে কোন সন্তান জন্মেনি। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর বিয়ে হযরত আউনের ভাই মুহাম্মদ (রা)-এর সঙ্গে হয়। এ বিয়েতে এক কন্যা জন্মে, যার মৃত্যু শৈশবেই হয়। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ভাই আবদুল্লাহ্ বিন জা'ফরের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। এ বিয়েতেও কোন সন্তান জন্মেনি। এ বিবাহিত জীবনেই তাঁর ইন্তিকাল হয় এবং একই দিন তাঁর পুত্র যায়েদ (রা)ও ইন্তিকাল করেন। এদের উভয়ের জানাযা একত্রে হয়। তাঁর থেকে কোন বংশানুক্রম চালু থাকল না। হযরত উমর (রা)-এর ইন্তিকালের পর হযরত উম্মু কুলসুমের যে তিন ভাইয়ের সঙ্গে বিয়ে হয়, তাঁরা ছিলেন হযরত আলী (রা)-এর ভাই হযরত জা'ফর তাইয়ার (রা)-এর পুত্র।

হযরত যয়নব (রা) তৃতীয় কন্যা। হযরত জা'ফর তাইয়ারের পুত্র হযরত আবদুল্লাহ্ (রা)-এর সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। এ বিয়েতে দু'পুত্র আবদুল্লাহ্ ও আউন জন্মগ্রহণ করেন। এ বিয়েতেই তিনি ইন্তিকাল করেন। তাঁর ইন্তিকালের পর তাঁর সহোদরা হযরত উম্মু কুলছুমের সঙ্গে হযরত আবদুল্লাহ্ বিন জা'ফরের বিয়ে হয়।

হযরত ফাতিমা (রা) থেকেই হুযূর (সা)-এর বংশানুক্রম চালু আছে। হুযূর (সা) হযরত ফাতিমা (রা)-কে সর্বাধিক ভালবাসতেন। সফরে গমনের সময় সর্বশেষে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতেন এবং সফর থেকে ফিরে এসে সর্বপ্রথম তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন। ওহীর মাধ্যমে তাঁর নাম রাখা হয়েছিল। তাঁকেও যারা তাঁকে ভালবাসে তাদের জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা করা হবে, তাই তাঁর নাম ফাতিমা। 'ফাতম'

শব্দের অর্থ রক্ষা করা। আর দীনের দিক দিয়ে ও মর্যাদার নিরিখে তিনি সমকালীন সমস্ত নারীকুলের মধ্যে অনন্য ছিলেন বিধায় তাঁকে 'বতুল' বলা হয়। 'বতুল' অর্থ স্বতন্ত্র, বিচ্ছিন্ন।

ইমাম আ'যম (রা) রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর স্ত্রীদের কথা উল্লেখ করেননি। এখানে সংক্ষেপে তাঁদের উল্লেখ করা গেল ঃ সর্বসম্মত মতে হুযূর (সা)-এর এগারজন বিবি ছিল। এদের মধ্যে হযরত খাদীজা (রা) ও হযরত যয়নব বিনত খুযাইমা (রা) ছাড়া বাকী নয়জন হুযূর (সা)-এর ওফাতের সময় বর্তমান ছিলেন। হুযূর (সা)-এর বিবিদের নাম–খাদীজা (রা), সওদা (রা), আয়েশা (রা), হাফসা (রা), যয়নব বিনত খুযাইমা (রা), উম্মু সালমা (রা), যয়নব বিনত জাহাশ (রা), জুয়াইরিয়া (রা), উম্মু হাবীবা (রা), সফিয়া (রা) ও মায়মূনা (রা)।

৪৬. তাওহীদের ব্যাপারে প্রশ্নের উদ্রেক হলে কি করণীয় ?

তওহীদের ব্যাপারে কোন মু'মিনের মনে কোন প্রশ্নের উদ্রেক হলে ইজমালীভাবে তাকে বিশ্বাস করতে হবে যে, এ ব্যাপারে আল্লাহ্ যা বলেছেন কেবল তা-ই সত্য। তারপর তাকে এ ব্যাপারে এমন কোন ব্যক্তির খোঁজ করতে হবে, যার কাছ থেকে সে তার প্রশ্নের উত্তর পেতে পারে। তবে এক্ষেত্রে চুপ করে থাকা অথবা দীর্ঘসূত্রিতা অবলম্বন করার কোন অবকাশ নেই। কেননা চুপ করে থাকা অথবা দেরী করা সন্দেহের জন্ম দেয় যা অস্বীকারের নামান্তর। মনের অনিশ্চিত অবস্থা, দ্বিধা, সন্দেহ ও সংশয় তওহীদের ব্যাপারে ঈমানের পরিপন্থী। ইলমে তওহীদের ক্ষেত্রে এর অবকাশ নেই। তবে ইলমে আহকামের ক্ষেত্রে আছে। এ জন্যই বলা হয় ঃ ইলমে আহকামে মতপার্থক্য ও ইখ্‌তিলাফ উম্মতের জন্য রহমত। পক্ষান্তরে ইলমে তওহীদে তা 'দালালাত' বা গোমরাহী। ইলমে আহকামে ভুল-ভ্রান্তি ক্ষমাকৃত কিন্তু ইলমে তওহীদে তা দোষণীয়।

৪৭. মি'রাজ সত্য

মসজিদুল হারাম থেকে মসজিদুল আকসা ও সেখান থেকে ঊর্দ্ধাকাশে আল্লাহ্ তা'আলা যেখানে চেয়েছেন, সে পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর রাত্রিকালীন ভ্রমণকে মি'রাজ বলা হয়। আল-কুরআনে ও হাদীসে এ সম্পর্কে যে কথা বর্ণিত হয়েছে তা সত্য। যে এতে বিশ্বাস করে না, একে সত্য বলে জানেনা, সে পথভ্রষ্ট, সে বিদয়াতী। কারো কারো মতে মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত মি'রাজ, যা আল-কুরআনের সূরা ইসরায় বর্ণিত, তা অস্বীকারকারী কাফির। তবে এখান থেকে ঊর্দ্ধাকাশের মি'রাজ অস্বীকার করলে কাফির হবে না ; বরং গোমরাহ হবে।

৪৮. দাজ্জালের আবির্ভাব ও কিয়ামতের অন্যান্য আলামত

আল-কুরআনে ও হাদীসে কিয়ামতের যেসব আলামতের কথা বর্ণিত হয়েছে, তা সত্য। তা অবশ্যই যথাসময় সংঘটিত হবে। সূরা কাহফে যূলকারনায়নের ঘটনায় বর্ণিত হয়েছে যে, তিনি এমন এক এলাকায় যাবেন, যেখানের অধিবাসীরা তাকে বলবে ঃ হে যুল-কারনায়ন! ইয়াজুজ ও মাজুজ পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে বেড়াচ্ছে। আমরা কি তোমাকে এ শর্তে কর দিব যে, তুমি আমাদের ও তাদের মাঝে এক দেয়াল গড়ে দিবে ? যূল-কারনায়ন বলল ঃ আমাকে এ ব্যাপারে যে ক্ষমতা আমার রব দিয়েছেন তা যথেষ্ট উত্তম, সুতরাং তোমরা আমাকে শ্রম দ্বারা সাহায্য কর। আমি তোমাদের ও তাদের মাঝে এক মযবুত দেয়াল গড়ে দেব। তোমরা নিয়ে এসো আমার কাছে লৌহ পিণ্ডসমূহ। পরে যখন মধ্যবর্তী ফাঁকাস্থান পূর্ণ হয়ে লৌহস্তুপ দুই পর্বতের সমান হলো তখন সে বলল ঃ তোমরা হাঁপরে দম দিতে থাক। যখন তা আগুনের ন্যায় উত্তপ্ত হলো, তখন সে বলল ঃ তোমরা নিয়ে এসো গলিত তাম্র, আমি ঢেলে দেই তা এর ওপর। তারপর ইয়াজুজ-মাজুজ তা আর অতিক্রম করতে পারল না। যুলকারনায়ন বলল ঃ এ আমার রবের অনুগ্রহ। যখন আমার রবের প্রতিশ্রুতি পূর্ণ হবে তখন তিনি এ দেয়াল চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিবেন, আর আমার রবের প্রতিশ্রুতি তো সত্য। কিয়ামতের দিন আল্লাহ্ তা'আলা তাদের ছেড়ে দিবেন, তারা একদল অপরদলের ওপর তরঙ্গের ন্যায় পতিত হবে। তারপর আল্লাহ্ তাদের সবাইকে একত্র করবেন। (১৮ ঃ ৯৪-৯৯) সূরা আম্বিয়ায় আল্লাহ্ তা'আলা বলেন ঃ এমনকি যখন ইয়াজুজ ও মাজুজকে ছেড়ে দেয়া হবে এবং তারা প্রত্যেক উঁচুভূমি থেকে ছুটে আসবে। (২১ ঃ ৯৬) এখানে অবশ্যম্ভাবীরূপে কিয়ামত সংঘটিত হওয়ার কথা বলে তারপূর্বে ইয়াজুজ ও মাজুজের আবির্ভাবের বর্ণনা দেওয়া হয়েছে।

কিয়ামতের আলামতের অন্যতম হলো পশ্চিমে সূর্যোদয় হওয়া। যখন এমনটি ঘটবে তখন কাফির যদি ঈমান আনে অথবা ফাসিক যদি তওবা করে তবে তা তাদের কোন কাজে আসবে না। যেমন আল কুরআনের ঘোষণা ঃ তারা কি অপেক্ষা করে শুধু এর যে, আসবে তাদের কাছে ফিরিশতা, কিংবা আপনার রব অথবা আসবে আপনার রবের কোন আলামত ? যেদিন আসবে আপনার রবের কোন আলামত সেদিন তার ঈমান কোন কাজে আসবে না, যে পূর্বে ঈমান আনেনি কিংবা যে ঈমানের মাধ্যমে কল্যাণ অর্জন করেনি। বলুন ঃ অপেক্ষা কর, আমিও অপেক্ষা করছি। (৬ ঃ ১৫৮)

কিয়ামতের পূর্বে ঈসা (আ)-এর দুনিয়ায় পুনরাগমন কিয়ামতের অন্যতম আলামত। আল-কুরআনের ঘোষণা ঃ ঈসা তো কিয়ামতের আলামত। সুতরাং তোমরা কিয়ামতে

সন্দেহ পোষণ করো না এবং আমাকে অনুসরণ করো। এ-ই সরল পথ। (৪৩ ঃ ৬১) কিয়ামতের পূর্বে ঈসা (আ) আসমান থেকে দুনিয়ায় আসবেন। দুনিয়ার সবাই তাঁর ওপর ঈমান আনবে। তিনি হবেন মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওপর ঈমান আনয়নকারী। সে সময় যেসব আহলে কিতাব পৃথিবীতে থাকবে তারা সবাই তাঁর ওপর ঈমান আনবে। আল কুরআনের ঘোষণা ঃ আহলে কিতাবের সবাই তাঁর মৃত্যুর পূর্বে তাঁর ওপর ঈমান আনবেই। তিনি কিয়ামতের দিন তাদের জন্য সাক্ষ্য হবেন। (৪ ঃ ১৫৯) কিয়ামতের পূর্বে দুনিয়ায় একমাত্র দীন, একমাত্র মিল্লাত হবে ইসলাম।

ইমাম আ'যম (র) কিয়ামতের আলামত থেকে চারটির কথা উল্লেখ করে অন্যগুলোর কথা ইজমালী ভাবে বলে দিয়েছেন যে, সহীহ হাদীসে যে সবের কথা উল্লেখ আছে তা সবই যথার্থ, সবই সত্য। ইমাম মাহদীর আগমন এসবের অন্যতম-। ঘটনা পরম্পরা এরূপ হবে ঃ প্রথমে মাহদী (আ) মক্কা ও মদীনার হরমে আত্মপ্রকাশ করবেন। সেখান থেকে বায়তুল মুকাদ্দাসে আসবেন। সেখানে তিনি দাজ্জালকে অবরোধ করবেন। এ অবস্থায় বায়তুল মুকাদ্দাসের পূর্বদিকে মিনারে ঈসা (আ) অবতরণ করে দাজ্জালকে হত্যা করার জন্য এগুবেন এবং হত্যা করবেন। তারপর তিনি মাহদী (আ)-এর সঙ্গে মিলিত হবেন এবং বায়তুল মুকাদ্দাসে সালাত আদায় করবেন। কারো কারো মতে এ নামাযের ইমামতি হযরত ঈসা (আ) এবং ভিন্নমতে হযরত মাহদী (রা) করবেন। তারপর সাত বছর পর তিনি ইন্তিকাল করবেন।

তিনি ৩৩ বছর বয়সে পৃথিবী থেকে আল্লাহ্র নির্দেশে আসমানে উত্থিত হন। পরে ৭ বছর পৃথিবীতে ফিরে আসার পর বেঁচে থাকেন। তাই পৃথিবীতে তাঁর সর্বমোট জীবন ৪০ বছরের। এ সাত বছর অবস্থানকালে তাঁদের দোয়ায় ইয়াজুজ ও মাজুজ ধ্বংস হয়ে যাবে। তাঁদের ইন্তিকালের পর পশ্চিম দিক দিয়ে সূর্যোদয় হবে। তখন তওবার দরজা বন্ধ হয়ে যাবে। মানুষের হৃদয় থেকে কুরআন তুলে নেয়া হবে। তারপর কোন এক সময় সিংগায় ফুঁক দেয়া হবে। আর কিয়ামত সংঘটিত হবে। এসব যা কিছু হাদীসে ও কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, তা সবই সত্য।

৪৯. আল্লাহ্ যাকে চান সিরাতে মুস্তাকীমের হিদায়াত দেন

আল্লাহ্ তা'আলা তাঁর বান্দাদের সবাইকে বিহিশতের দিকে, তাদের সবাইকে শান্তির আবাসের আহবান জানান। কিন্তু যারা তাঁর সে আহবান গ্রহণ না করে স্বেচ্ছায় অন্যপথে চলতে চায়, তিনি তাদের তওফীক দেন। আল কুরআনের ঘোষণা ঃ আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের আহবান জানান শান্তির আবাসের দিকে এবং

যাকে ইচ্ছা করেন সরল পথে পরিচালিত করেন। (১০ ঃ ২৫) তাই বান্দার উচিত আল্লাহ্র আহবানে সাড়া দেওয়া, তাঁর তওফীক প্রার্থনা করা, তাঁর করুণা ও ক্ষমা যাঞ্চা করা।

ইমাম আ'যম (রা) তাঁর জীবদ্দশায় এ গ্রন্থ লিখে গেছেন। আর তাঁর আল-অসিয়াত গ্রন্থ মৃত্যুর পূর্বে লিখেছেন। তাই তিনি তাঁর জীবদ্দশায় লেখা গ্রন্থে মু'মিনদের জন্য সর্বশেষে এ ইঙ্গিত করে গেছেন যে, সবার এ আকীদা রাখতে হবে যে, মানুষ তার কর্মের ইচ্ছার স্বাধীনতায় যা করতে চায় আল্লাহ্ তাকে তা করতে দেন। একজন মু'মিন যেন তার সারা জীবন ধরে আল্লাহ্র ডাকে সাড়া দিয়ে নেক কাজ করার তওফীক আল্লাহ্র কাছে কায়মনে চায়। আল্লাহ্ ন্যায়পরায়ণ, তিনি যালিম নন, তিনি বান্দাকে জান্নাতের শান্তির আবাস দিতে চান। বান্দা যেন সে আবাস লাভ করতে পারে, সেজন্য তাকে আকীদায় ও আমলে হতে হবে নিবেদিত, উৎসর্গিত।

ঃ সমাপ্ত ঃ

ইফাবাঃ/২০০১-২০০২/অঃসঃ/২৭৫১/(রাজস্ব)-৩২৫০